প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা

অসীম সাহা

৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

[স্ব] অভ্র ও অর্ঘ্য

PROGOTISHIL
SAHITYER
DHARA
BY
ASIM SAHA

প্রথম প্রকাশ/
আগস্ট ১৯৭১

প্রকাশক/
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মুদ্রাকর/
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ/
সৈয়দ ইকবাল

নরেন বিশ্বাস
আহমদ ছফা
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীক্রম

প্রগতিশীল সাহিত্যের পটভূমিকা

বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো সুনির্ধারিত সংজ্ঞার অবভাস যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অসম্ভবও বটে। অবশ্য বিষয়বিমূর্ততা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু বিমূর্ত বিষয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কিত উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে কারো মত-ভিন্নতা নেই।

সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা উপস্থাপন সম্ভব নয়। হয়তো কৌণিক এবং খণ্ডিত আভাস দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তা সাহিত্য সম্পর্কিত সম্যক ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে পারে না। এ পর্যন্ত যে সকল আভাস ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা বিস্তীর্ণ বনভূমিতে সূর্যালোকের টুকরো প্রতিফলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু সাহিত্য বস্তুর বিকল্প-প্রতিবেদন নয়, সেহেতু তার একটি ভিন্ন রকম মূল্যায়ন অবশ্যই স্বীকৃত। বিশেষত চৈতন্য-ব্যবধান ব্যক্তি মানসতায় যখন সুস্পষ্ট, তখন এই ভিন্নতর মূল্যায়ন অবশ্যই গ্রাহ্য, আন্তরিকতায়। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য বস্তুর বিকল্প প্রতিবেদন নয়। জীবন ও জগত সাহিত্যের উপাদান হলেও তার স্থূলতা অত্যয়ী আত্মপ্রকাশ মহৎ সাহিত্যের পরিচয়কে আলোকিত করে। এ কারণে সাহিত্যের সত্যে ও বাস্তব সত্যে ব্যবধান সচলিত। বাস্তবের অখণ্ড অনুকৃতি যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি বাস্তবকে অস্বীকার করাও সাহিত্য নয়। সাহিত্যের সত্য এই দুইএর কেন্দ্রভূমিতে সমন্বয় সাধন করে, শৈল্পিক লেন্সে ধারণ করে জীবনকে, যে জীবন বৃহত্তর মানসতার শাশ্বত বৃত্তি অবলম্বিত। মানব হৃদয়ের এই শাশ্বত বৃত্তির শৈল্পিক প্রকাশের ওপরই নির্ভরশীল সাহিত্যের সার্থকতার প্রশ্ন। তার যুগঅত্যয়ী অস্তিত্ব-সংস্থিতি।

কিন্তু এই শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ সম্পর্কে শ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী মানসতায় ব্যবধান রয়েছে। যাঁরা শ্রমজীবী মানসতার সপক্ষে, তাঁরা বৃহত্তর মানসভূমির সামগ্রিক পরিচয় উদঘাটনে বিশ্বাসী। যাঁরা তা নন, তাঁরা

কতিপয় মানসতার প্রকাশে জীবন সম্পর্কিত মিথ্যে ধারণা দিতে অভ্যস্ত। ফলে একটি ভিন্নমুখী বাতাসের আঘাতে সাহিত্য সম্পর্কে পাঠক মানসে বিভ্রান্তি অনিবার্য। পরশ্রমজীবী মানসতার এই প্রচেষ্টার অন্তর্বৃত কারণ সামাজিক অবস্থার নিভৃতে অনুসন্ধ। এ কথা আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সাহিত্যেও ঔপনিবেশিক শাসন চলে। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব-বলয় সমস্যা সৃষ্টি করে। এক কথায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। পূর্বাপর প্রতিটি সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন সাহিত্যের দর্পণে ধরা পড়ে। সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে। স্রষ্টা চৈতন্য যেহেতু সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু সামাজিক উত্থান পতন তাঁকে আলোড়িত করতে বাধ্য। চারদিকের চলমান জীবন স্পন্দনকে অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বেঁচে থাকা অসম্ভব। সাহিত্যস্রষ্টা সমাজের সবচাইতে সূক্ষ্ম কারিগর। যার, সবচেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়স্পর্শী হৃদয়-মাইক্রোফোনে প্রতিধ্বনিত হয় সমাজের যে কোনো রকম স্পন্দন। চর্যাপদের গুহ্যতত্ত্বের আড়াল ভেঙে যখন উচ্চারিত হয়ঃ টালত মোর ঘর নাহি পরবেশী/হাড়িত ভাত নাহি নীতি আবেশী। কিংবা ভারতচন্দ্রের অমর চরিত্র ঈশ্বরী পাটনীর কণ্ঠে যখন বাঙালী মাতৃহৃদয়ের একান্ত আকাঙ্খার প্রকাশ দেখিঃ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, তখন অনিবার্যভাবেই সমস্ত বাহ্যিকতা ছিন্ন করে হৃদয়ের গভীরে যা প্রতিধ্বনিত হয়, তা তৎকালীন সমাজপরিচয়েরই মূর্ত প্রকাশ। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করতে হয়, সাহিত্যে প্রগতিশীলতার যাত্রারম্ভ আসলে সেখান থেকেই। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যার অগ্রগামিতা জীবনের সপক্ষে, মানব কল্যাণের স্বার্থে কাজ করে যায়, তারই নাম প্রগতিশীলতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার প্রশ্নে মতভেদ থাকে। যা সময়ের সাথে তাল মেলাতে সক্ষম নয়, তা অনিবার্য ভাবেই নির্বাসিত হয়। মতবাদের পরিবর্তন ঘটে; কেননা মতবাদে হৃদয়বৃত্তির কারবার নেই; তার কারবার বিশেষ সময়কে, বিশেষ যুগকে কেন্দ্র করে। ফলে তার অধিকাংশই নির্বাসিত হয়ে যায়। এক মতবাদের শেকড় উপড়ে ফেলে ভিন্নতর মতবাদ শেকড় প্রোথিত করে। মতবাদ (ইজম) বা বিশেষ দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রগতিশীলতা সময় কেন্দ্রিক। কিন্তু

সাহিত্যের প্রগতিশীলতা তেমন নয়। শাশ্বত সাহিত্য বিতত ক্রমাগত যুগ থেকে যুগান্তরে। রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতা থাকলেও কিংবা সমাজকাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হলেও শাশ্বত সাহিত্য চিরকালই সমমর্যাদায় অভিনন্দিত হয়।

আধুনিক যুগে শাশ্বত সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে পূর্বে যা নন্দিত হয়েছে, তা বর্তমানে নিন্দিত হচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের চিরন্তনতা নির্ণয়ের জন্যে যে যুগ-অত্যয়ী কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, সে প্রেক্ষিতে সামন্ত, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রচিত সাহিত্য যেমন, তেমনি তার অবশেষ মুহূর্তের সাহিত্যও একই মর্যাদায় সুচিহ্নিত হয় এবং এও সত্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়ও শাশ্বত সাহিত্য সমমর্যাদা পেতে বাধ্য।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি তাই হয় তবে সাহিত্যে প্রগতিশীলতার উচ্চা-রণ কি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? এ জাতীয় প্রশ্ন একমাত্র সাহিত্যের মৌল চেতনা-বিচ্যুতির ফলশ্রুতি হতে পারে। লক্ষণীয় যে, যে কোনো মহৎ সৃষ্টি, যা শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ, তা অবশ্যই প্রগতিশীল। প্রগতিশীল আন্তর পরিচয়ে, বহিঃপ্রকাশে নয়। সামন্ত যুগের যে কোনো মহৎ সৃষ্টিকর্ম বাইরাবরণে কেবলমাত্র সামন্ত চিহ্নিতি বহন করে থাকে। কিন্তু তার অন্তর্বর্তি কোরকে যে হৃদয়-সুরভী, তাকে কি প্রগতিশীল না বলে সামন্ত হিশেবে চিহ্নিত করা চলে? পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে এই একই উচ্চারণ প্রযোজ্য। আসলে যার যার যুগে যে কোনো মহৎ স্রষ্টাই প্রগতিশীল। যুগান্তরে বাইরে থেকে অপ্রগতিশীল মনে হলেও, অনুভবের নিভৃত কপাট উন্মোচনে লক্ষ্য করা যাবে প্রগতিশীলতার দীপ্তিময় অঞ্চল—যা যে কোনো যুগেই নির্দ্বিধায় গ্রহণীয় হতে পারে।

এ হলো প্রগতিশীলতার ব্যাপকতম অর্থপ্রবাহ, যা মৌলিক এবং যৌক্তিক। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার যে পরিচয়, তার প্রভাব সাহিত্যের অন্তর্নিহিত স্রোতস্বিনীকে ভিন্নমুখী করে না এমন নয়। আর এ কারণে সাহিত্যে প্রগতিশীলতার প্রকাশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন অত্যন্ত

সহজ হয়েও জটিলতা-আশ্রয়ী। ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় পুঁজি হচ্ছে প্রধানতম হাতিয়ার। এই মারাত্মক হাতিয়ারে আহত কিংবা নিহত জীবনবোধ। আর জীবনবোধের মৃত্যু মানেই সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবল খরা, বৃষ্টিহীনতা। বিশ্ব-বর্তমানে জীবনজটিলতা সর্বত্র। এই জটিলতা থেকে মুক্তির জন্যে বস্তুবাদী দর্শনে সমর্পিত বৃহত্তর মানসতা—যাঁরা প্রগতিশীল হিশেবে চিহ্নিত। আর এই মানসতা প্রতিহরণে সর্বত্র বিস্তৃত সাম্রাজ্যবাদ। বিশেষত তা প্রবলভাবে অগ্রগামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে। যেহেতু সাহিত্যিকেরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, ফলে সুবিধাবাদী; সেহেতু তাঁরা সমর্পিত সাম্রাজ্যবাদের হাতে। এ ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ অগ্রসর নয়া ঔপনিবেশিক কৌশলে। সেখানে শিকার সার্থক। তাই প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার। যাঁরা এরই মধ্যে নিজস্ব সৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় ভাস্বর, তাঁরাই প্রগতিশীলতার সুমহান অগ্রনায়ক। সাধারণত এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পূর্বাপর ইতিহাসে অত্যন্ত নগণ্য। একমাত্র একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিকের পক্ষে এই ধরনের প্রয়াসে অবতীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আসলে প্রগতিশীল সাহিত্য বিচ্ছিন্ন-প্রতিবেদন নয়। স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনকে বাদ দিয়ে বর্তমান যুগে সাহিত্যের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। কেননা স্রষ্টা কুক্রিয়াশীল হয়ে প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। যাঁরা পারেন তাঁদের মধ্যে আত্ম-প্রতারণা রয়েছে। ফলে জীবনের এবং জীবনের প্রতিফলনের এই ব্যবধান কুক্রিয়াশীলতার পথকেই সুগম করে দেয়।

অনেকে মনে করেন সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো অযৌক্তিক। কেননা সাহিত্যের কারবার হৃদয়বৃত্তি নিয়ে। সে ক্ষেত্রে রাজনীতির অঙ্কন সাহিত্যের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করে। আমাদের মনে হয় এ বক্তব্য অযৌক্তিক এ কারণেই যে, যেহেতু সামাজিক উত্থান-পতনের কেন্দ্র স্পর্শ করে আছে রাজনীতি, সেহেতু সমাজ-কাঠামোতে অবস্থান করে তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আর সে চেষ্টাও পলায়নপরতা মাত্র। স্বীকার্য যে, রাজনৈতিক নেতা যে ভাবে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন, সাহিত্যিক সে ভাবেই আলোচনা করবেন না। কিন্তু তা

রাজনীতির বর্জনকে স্বীকার করে না স্বাভাবিকভাবেই। রাজনীতি কোনোক্রমেই শিল্প (আর্ট) নয়। কিন্তু সাহিত্য অবশ্যই শিল্পকর্ম। সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে তার শিল্পমানতার সার্থকতার ওপরে। ফলে সাহিত্যের উপাদান যাই হোক না কেন, তাকে মহৎ সাহিত্যের শিরোপা লাভে অবশ্যই শিল্পসম্পন্ন হতে হয়। রাজনীতি সাহিত্যের উপাদান হওয়া সত্ত্বেও তা শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে, এ দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। তবে সত্য, যাঁরা তা পেরেছেন তাঁরা ব্যক্তিজীবনে যেমন প্রগতিশীল ছিলেন, সাহিত্যের প্রকাশেও তাঁরা তেমনি প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করেছেন। সন্দেহ নেই যে, মহৎ স্রষ্টার কাছে উপাদান তেমন বড় কথা নয়। যে কোনো ভিত্তির ওপরে সৌধ নির্মাণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব।

পরশ্রমজীবী যাঁরা, তাঁরা শ্রেণীগত দিক থেকেই উল্টোমুখী। সময়ের অগ্রগামিতার পথ রুদ্ধ করতে চান। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবেই তা অসম্ভব। ফলে প্রগতিশীল ভূমিকাই গ্রাহ্য যুগে, যুগ অতিক্রমে। যাঁরা জীবন কিংবা মানবতার বিপক্ষে, তাঁরাই কুক্রিয়াশীলতাকে ধারণ করেন। বৃহত্তর জীবন এবং তাদের মানস-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন সেখান থেকে নির্বাসিত। কতিপয়ের আনন্দ উৎসারে যাঁরা সমর্পিত, সাহিত্যের প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা স্পষ্টত সোচ্চার। তাঁদের মতেঃ সাহিত্যিকের স্বাধীনতা রয়েছে যথেচ্ছ প্রকাশে। এ কারণে কতিপয় মানসতার প্রকাশও সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। আমরাও স্বীকার করি তা সম্ভব। কিন্তু কতিপয় মানসতার প্রকাশ যদি বৃহত্তর জীবনের কল্যাণবিরোধী হয়, তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। কেননা কতিপয়ের জন্যে আমরা অধিকাংশকে অস্বীকার করতে পারি না। সাহিত্যে প্রগতিশীলতার যাঁরা ধারক, তাঁরা এই সত্যেই বিশ্বাস করেন।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনো দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, সাহিত্যে প্রগতিশীলতার প্রকাশই সাহিত্যের চিরন্তনতাকে স্থিরিত করে। প্রগতিশীলতা সম্পর্কে যাঁরা স্থূল বিশ্লেষণে সমর্পিত তাঁরাও যেমন, তেমনি ব্যাপকতম অর্থের ধারকেরাও মূলত একই কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করে শিল্প-সার্থকতায়

উত্তীর্ণ হন। শুধু শ্লোগান কিংবা রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা কখনো প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করে না। একজন অনুচ্চ কণ্ঠের মানুষও প্রগতিশীল হতে পারেন। সাহিত্যিক প্রধানত অনুচ্চ কণ্ঠের অধীশ্বর। তাঁদের সার্থক সৃষ্টিকর্ম প্রগতিশীল নয়, এমন উচ্চারণ অসম্ভব।

অবশ্য স্বীকার্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় যেমন তার অন্তর্নিহিত চেতনার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল, একই সঙ্গে তার আঙ্গিক বদলের আধুনিকতার ওপরও নির্ভরশীল। এ যুগে চেতনাগত দিক থেকে প্রগতিশীল হয়েও কেউ যদি পয়ারের পুরনো আঙ্গিক কবিতায় ব্যবহার করেন তবে তাঁর প্রগতিশীলতা পরিপূর্ণ নয়, এ কথা জোরের সাথেই উচ্চারণ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার সাথেই তাল মিলিয়েছেন ক্রমাগত। সময়-পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনিও পরিবর্তিত হয়েছেন। চেতনাকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। আর সে জন্যেই তাঁকে প্রগতিশীল হিশেবে স্বীকার করতে দ্বিধার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

সাহিত্যে প্রগতিশীলতার পটভূমি ব্যাপকতা-আশ্রিত সন্দেহ নেই। আর এই ব্যাপকতাই সাহিত্যস্রষ্টাকে উত্তীর্ণ করে মহত্বের সুবর্ণ সিংহাসনে— যা বৃহত্তর জীবনের অন্তর-স্পন্দনে স্থিত। ফলে স্রষ্টা যুগে, যুগ-অত্যয়ে স্বীকার্য, মহৎ স্রষ্টা হিশেবে। শাশ্বত সাহিত্যের শাশ্বত কারিগর হিশেবে হৃদয়-নেপথ্যে স্পন্দিত প্রগতিশীলতার অনিবার্য প্রতিধ্বনি।

সাহিত্যে গণনীতি

সাহিত্যে গণনীতির প্রতিফলন ঘটে স্রষ্টা সমাজের সাথে সংযুক্ত বলেই। প্রতিটি মানুষের চিন্তা, ভাবনা ও অনুভূতি যেহেতু পারিপার্শ্বিকতা বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু এই দুর্মোচ্য প্রতিক্রিয়াকে ধারণ করেই সৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। অন্যথায় স্রষ্টা সমাজ-সম্পর্ক রহিত বায়বীয় অবয়ব হিশেবে স্বীকৃত হতে পারেন, একজন সত্যিকার মানুষ হিশেবে চিহ্নিত হতে পারেন না। ফলে গণ-মানুষের সাথে সাহিত্যের সম্পর্কের প্রশ্নটি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বৃহত্তর জনগণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। সাহিত্য, স্রষ্টার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার শৈল্পিক ফলশ্রুতি। এ কারণে সামাজিক অস্তিত্বের ওপরই স্রষ্টার চেতনা নির্ভরশীল। যেহেতু 'গণ' মানেই জনগণের বৃহত্তর অংশ, সেহেতু সাহিত্যে এই বৃহত্তর মানসভুবনের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী।

এ প্রসঙ্গে সাহিত্যে গণনীতি প্রতিফলনের মৌল কারণ সন্ধানের পূর্বে বর্তমান প্রেক্ষিতে গণনীতি কোন শ্রেণী-চেতনাকে ধারণ করছে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের আলোচনায় গণনীতি শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে রাজনীতি শব্দটির বিকল্প হিশেবে। দ্বান্দ্বিক সংঘাত এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে রাজনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তার অর্থগত পরিবর্তনও ঘটেছে। যে অর্থে পূর্বে রাজনীতি শব্দটি ব্যবহৃত হতো, তার পেছনে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ছিলো। তৎকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজ-রাজড়া, সম্রাট বাদশা প্রভৃতি জাতীয় লোক। এবং সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো যেহেতু রাষ্ট্রীয় নিয়মানু-সারে, সেহেতু রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনই এই নিয়ম-নির্দিষ্ট দলিল দস্তাবেজে প্রচলিত ছিলো। আর অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই সেইসব সামন্ততান্ত্রিক শব্দাবলী আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার

করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও! অথচ বর্তমানে ইংরেজী politics এর শাব্দিক অর্থ হিশেবে 'রাজনীতি'কে ব্যবহার করার যে কথা বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক চেতনাকে জিইয়ে রেখে শোষিত শ্রেণীর ওপর শোষকের প্রভুত্ব বজায় রাখার কৌশল মাত্র। যুগবিবর্তনের সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। কারিগরী সমৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাই এরা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে আলাদা গোষ্ঠী হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার 'হাতবদল' হয়ে ভিন্নদেশের পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে নেতৃত্ব শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর হাতে এসে পড়েছে এবং পড়ছে। আর কৃষক শ্রমিক যেহেতু গণ-বিচ্ছিন্ন নয় বরং গণসমর্থিত এবং বর্তমান যুগে তৎকালীন রাজনীতি যেহেতু গণমানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু তা 'গণনীতি' হিশেবে স্বীকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সাহিত্যিক, সমাজের সবচেয়ে সচেতন কারিগর বলেই তাঁদের হাতে 'গণনীতি'র শৈল্পিক প্রতিফলন আশা করাই যৌক্তিক।

সাহিত্যের সাথে গণনীতির সম্পর্ক পরোক্ষ, যদিও 'গণ'র সম্পর্ক তা নয়। 'গণ' ও গণনীতির সাথে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষত তা সাহিত্যের ব্যাপারে। কারণ সাহিত্যে গণমানুষের জীবনের প্রতিফলন থাকবে কিন্তু গণনীতির প্রতিফলন সমভাবে না ও থাকতে পারে। রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্যে গণনীতির প্রয়োজন অনিবার্য, কিন্তু সে জন্যে গণ নীতি পরিত্যক্ত ও হতে পারে। মানুষ 'গণ' এর অন্তর্ভুক্ত হলেও সামাজিক সহাবস্থান সত্ত্বেও তার নিজস্ব এবং একান্ত কিছু অনুভূতি থাকে। সকল সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রতিটি মানুষের ভেতরে সমভাবে ক্রিয়া করে না বলেই ব্যক্তিক অনুভূতির মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্যক্তিক অনুভূতির এই ভিন্নতা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে প্রতিটি মানুষই একটি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, যাকে 'গণ' হিশেবে চিহ্নিত করা হয়। আর রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাচেতনার রীতিগত প্রতিফলনকেই বলা যায় গণনীতি।

সাহিত্যেও গণনীতির প্রতিফলন ঘটে। কারণ, প্রতিটি মানুষই তার রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিপার্শ্বকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। সাহিত্যিকের চিন্তা-ভাবনার সাথে একজন সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনার সাদৃশ্য থাকে। আর এ কারণেই তাঁর সৃষ্টিতে এর প্রতিফলন স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রতিফলন শুধুমাত্র অনুকৃতি নয়, শিল্পিত প্রতিশ্রুতিও বটে। দেয়ালপত্র যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি দেয়ালপত্রকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়াও সাহিত্য নয়। দুটোকে সার্থক-ভাবে মিলিয়ে দিতে পারলে দেয়ালপত্রকেও সাহিত্যে উত্তীর্ণ করা সম্ভব।

এ সত্য অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যও এক ধরনের শিল্প। ইংরেজীতে যে অর্থে culture শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বাঙলায় তার শব্দার্থে সংস্কৃতির একটি শাখা হিশেবে সাহিত্য অবশ্যই পরিমার্জিত শিল্প। কিন্তু তা অবশ্যই শিল্পের তান্ত্রিক মতের পোষক নয়। শিল্প জীবনকে নিয়ে এবং এ জীবন গণজীবন। আর গণনীতিও জীবনসংযুক্ত। ফলে সামাজিক জীব হিশেবে সাহিত্যিক অবশ্যই গণনীতি সচেতন। তবে যে স্থূল অর্থে গণনীতি শুধু প্রচারপত্রে, নেতার কণ্ঠে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় শোভিত, সে অর্থে সাহিত্যিকের সচেতনতার বিশ্লেষণ করতে যাওয়া তাঁর শিল্পীসত্তার ওপর অনাবশ্যক ভার চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সাহিত্যিক শিল্পের তাত্ত্বিক মতের প্রবক্তা নন বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের নগ্ন অনুকারও নন। সাহিত্যকে অবশ্যই সাহিত্য হতে হবে। এবং সে জন্যে সাহিত্যিকের নিজস্ব স্টাইল বা রীতি প্রয়োজন। সাহিত্যিকের এই স্টাইলের ওপরই নির্ভরশীল বিষয়ের স্থূলতার উত্তরণ।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে গণনীতির যথাযথ প্রকাশের ওপরই নির্ভর-শীল তার সার্থকতার প্রশ্ন। কারণ সাহিত্যে গণনীতির যে প্রশ্নটি বর্তমান যুগের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়, তা সমাজ সচেতনা থেকে উদ্ভূত বলেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। আর সমাজ সচেতনা যেহেতু সাহিত্যে নতুন কথা নয়, সেহেতু এ প্রসঙ্গে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ কাম্য। যে কুক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া হিশেবে ভাববাদী চিন্তা মানুষকে

নিয়ে অলৌকিক স্বপ্নচারিতায় আচ্ছন্ন ছিলো, সেখানে সমাজ-সচেতনার প্রকাশ অস্পষ্ট ছিলো বলেই সাহিত্যে গণনীতির প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। 'বিশুদ্ধ' বা 'নির্মল' সাহিত্য সৃষ্টির নামে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য বজায় রেখে শোষক শোষিত ব্যবধানকে বিস্তৃত করাই ছিলো 'ভাববাদী ধারণার প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য। জীবন সম্পর্কে অলৌকিক ধারণার যে প্রকাশ সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী সাহিত্যের উপাদান ছিলো, তা গণনীতিকে ধারণ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। যদিও প্রাচীন সাহিত্যেও গণসচেতন কিছু কিছু কবির কণ্ঠে রাজা-বাদশার গুণকীর্তনের অথবা দেবদেবীর প্রণয়লীলা বর্ণনার অন্তরালেও গণনীতির ভিন্নতর ছায়া-পাত লক্ষ্য করি আমরা এবং এ থেকে এ সত্যই স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায় যে, যে কোনো স্রষ্টার সৃষ্টির অন্তরালে সমাজপ্রবাহের ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু বিভিন্ন বিধি-নিষেধে তা পথে পথে বাধাগ্রস্ত বলেই অন্তরালবর্তী।

কিন্তু এ যুগ গণমানুষের যুগ। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে জীবন-জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক মুক্তিকামনায় বিশ্বব্যাপী সোচ্চার। এ প্রেক্ষিতে গণনীতির প্রতিফলনে শৈল্পিক রীতিকে ধারণ করেই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ্য যে, সাহিত্যে বর্তমানে গণনীতির প্রতি-ফলনের নামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্যের বদলে প্রচুর আগাছা সৃষ্টি হচ্ছে, যার সঙ্গে একমাত্র প্রচারপত্রের তুলনা হতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, সাহিত্য কখনও 'প্রপাগাণ্ডা' নয়, জীবনের শিল্পিত প্রকাশ। কিন্তু তার অর্থ এ-ও নয় যে, সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না। ব্যাপকতম অর্থে প্রতিটি সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক—যদিও সাহিত্য, স্রষ্টার মনের বিশেষ মুহূর্তের প্রতিফলন, যার উদ্দেশ্য আনন্দ ও কল্যাণ। আর এর পেছনেই তার উদ্দেশ্য সক্রিয়। তবে স্থূল অর্থে সাহিত্যে উদ্দেশ্যের প্রয়োগ ক্ষতিকর। কিন্তু এর সমালোচনা করতে গিয়ে যাঁরা সাহিত্যের অলৌকিক সংজ্ঞা উপস্থিত করেন, তাঁরাও অনি-বার্যভাবে পরিত্যাজ্য। জীবনমুখী সাহিত্যের প্রতি নাক সিঁটকিয়ে যাঁরা

সাহিত্যকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আনন্দের উপাদান হিশেবে চিহ্নিত করেন, তারা কল্পনার জগতে হাওয়ায় ভেসে বেড়ান মাত্র। তাই গণজীবন যেমন, গণনীতিও তেমনি তাঁদের কাছে নিন্দিত, ফলে নির্বাসিত। অবশ্য এ শ্রেণীর মানসতা ঐতিহাসিক কারণেই বৃন্তবিচ্যুত হতে বাধ্য।

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু তাকে কতগুলো নির্মিত আচরণের মধ্যে যেমন বাস করতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক আইনের আওতাকেও স্বীকার করতে হয়। এবং রাষ্ট্র মানেই যেহেতু এখন পর্যন্ত প্রধানত অর্থনৈতিক বৈষম্যগত কারণে শোষক শোষিতের মধ্যে ব্যবধান, সেহেতু গণনীতির প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে অনিবার্য। অবশ্য 'রাজনীতি' শব্দটির অস্তিত্ব যে এখন পর্যন্ত অবিলোপিত, তার কারণ সামাজিক সম-বিশ্ব স্থাপনের ব্যর্থতা এবং ধনতান্ত্রিক শক্তিকে জিইয়ে রেখে ফ্যাসি-বাদের কৌশলি প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর জনসংখ্যাকে অস্বীকার করা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সচেতন কৃষক-শ্রমিক সমাজকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নয়। কারণ বৃহত্তর জনসমাজ যেহেতু অর্থ-নৈতিক মুক্তির জন্যে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, সেহেতু বর্তমান যুগে গণনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছে। আর সাহিত্যে গণমানুষের মুক্তির ইচ্ছের শিল্পিত প্রতিফলনই হচ্ছে গণনীতির প্রতি-ফলন। সাহিত্য সমাজচেতনাকেই ধারণ করে। ফলে গণনীতির প্রকাশ সাহিত্যে অনিবার্যভাবে ঘটে যায়। বিশেষত সচেতন শিল্পী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এ সত্যকে ধারণ করতে হয় স্পষ্টতই। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, গণনীতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। সেটা ঘটে ব্যক্তিক অনুভূতির কারণে। মৌল চেতনার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা গণনীতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন, একটা চাঁদ মূল লক্ষ্য হলেও এক একজন এক একভাবে চাঁদকে অনুভব করেন এবং এই দেখার বিভিন্নতা থাকে বলেই নীতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। সাহিত্যিক অথবা শিল্পীও যেহেতু গণমানুষের সমপর্যায়ী, সেহেতু তাঁদের দেখার মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্যিকের দেখা, সাহিত্যিক শিল্পিত করে প্রকাশ করতে পারেন

বলেই তা সাহিত্য হিশেবে স্বীকৃত হয়, কিন্তু যিনি তা পারেন না তাঁর সৃষ্টি শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ বাক্যই থেকে যায়, সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারে না। অতএব এ সত্য অনস্বীকার্য, দৃষ্টির ভিন্নতার কারণে গণনীতিতেও পার্থক্য দেখা যায় এবং সাহিত্যেও তা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে ভিন্নতা থাকার ফলে গণনীতিতে যে দূরত্ব থাকে, নীতির পার্থক্য সত্ত্বেও তা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ গণনীতির বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের সাহিত্য হতে বাধা নেই।

তবে সাহিত্যের সাথে সমাজের যে সম্পর্ক, গণনীতির সম্পর্ক ঠিক তেমন নয়। কারণ সাহিত্যের প্রধান কাজ হৃদয়বৃত্তি নিয়ে। ফলে নৈতিক (moral) স্থূলতা নিয়ে সাহিত্য সব সময় আন্দোলিত হয় না। বৃহত্তর সমাজমানসের কিছু কিছু সাধারণ (common) প্রতিক্রিয়া, সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতির অকৃত্রিম চিত্র তুলে ধরাই সাহিত্যের কাজ। অবশ্য গণনীতির সাথে সংযুক্ত, মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিভিন্ন ধারার প্রতিফলনও সাহিত্যের উপজীব্য। কিন্তু সরাসরিভাবে গণনীতি সাহিত্যের উপাদান নয়। ব্যাপকতর অর্থে সাহিত্যে গণনীতির প্রকাশ স্বীকৃত, স্থূলতর অর্থে তা অবশ্যই বিসর্জিত।

অতএব এ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত যে, সাহিত্যের সাথে গণনীতির সম্পর্ক স্থূল নয়। গণনীতির প্রতিফলন পরোক্ষভাবে এবং বলা চলে, কতকটা শিল্পিতভাবে ঘটে। সাহিত্যে গণনীতির প্রকাশ তাই কাম্য, কিন্তু গণমানুষের হৃদয়ের প্রতিফলন অনিবার্য।

শিল্প-শিল্পী: সামাজিক দায়িত্ববোধ

শিল্প কি? শিল্প কি সেই সচল শব্দমালা, যা অনুভূতির গোপনতম প্রাসাদ থেকে উৎসারিত হয়ে বাক্যের বাগানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে এবং যা অনিবার্যভাবেই সমাজের প্রতিটি অনু পরমাণু থেকে রস সংগ্রহ করে সজীব ও সবল হয়ে ওঠে? যে কোন সচেতন ও বস্তুদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠক (মানুষ) অবশ্যই এই ঋজু ও সুরেখ সত্য সংগঠনার প্রতি আত্ম-সমর্থন জ্ঞাপন করতে বাধ্য। কেননা এই অনিবার্য বৃত্তের মধ্যে জলের আবর্তের মতো তাঁরাও পাক খাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। অনুভূতি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, রক্তাক্ত মানসতা দিয়ে, এমনকি জীবন দিয়েই তাঁরা এই সত্য-স্বীকৃতির উপাদান হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। যে সমাজের মর্মমূলে তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের জীবনের শেকড় আমূল প্রোথিত, সেখানে একটু হাওয়া লাগলেই দুলে ওঠে; ঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা প্লাবনে তাঁদের অবস্থা মৃত্যুগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। এ কোনো নতুন কথা নয়, পুরনো কথাই নতুন করে বলা। ইতিহাসের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটাই সত্য, এটাই শাশ্বত। মানুষ তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণেই সমাজের সামগ্রিক উত্থান পতনে শিল্পী ব্যক্তিজীবনে শিল্পীজীবনেও আলোড়িত। এই আলোড়ন কতোটুকু সার্থকভাবে তাঁর কর্মে প্রতিফলিত হবে, তা তাঁর অন্তরে এই সকল ঘটনাবলী কতোটুকু দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে, তারই ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তবে কি শিল্পী সম্পূর্ণরূপে সমাজের দাস? সে কি তবে সমাজেরই ক্ষমতাবিহীন বাণীবাহক? সত্য যে, মানুষের চেতনা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কেননা মানুষ কোনো সময়ই একটি বিশেষ কেন্দ্রে বন্দী থাকার ঘোর বিরোধী। তাই বিবর্তনের

ঐতিহাসিক নিয়মেই তাঁরা সমাজবদলের অনিবার্য তাগিদে আলোড়িত। সামন্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় উত্তরণ এবং বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দিকে মানুষের অভিসারের অন্তর্নিহিত কারণও সেখানেই ভিত্তিত। এই বোধ কিংবা এই আকাঙ্খা আকস্মিক নয়, সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে ফুটে ওঠা তাগিদেরই বহিপ্রকাশ। মানুষের বোধ, বোধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, প্রভৃতি সমাজ গঠনের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা মনের গভীরে এঁকে দেয়ার ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো সমাজ-কাঠামো বদলে নিচ্ছে, গড়ে নিচ্ছে নতুন সমাজ, কারো কারো মনের গহনে এ ধারণা সংস্থিত রয়েছে। কিন্তু এই জ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে যে চিন্তা-চেতনা সক্রিয়, তার জন্মস্থান, নাম, ঠিকানা কোথায়? নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, সমাজ নামক একটি আলোকোজ্জ্বল নগরীতে, যাকে এড়িয়ে গিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। ফলে এ সত্যকে যে কোনোভাবেই উন্মোচন করা হোক না কেন, সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আর মানুষের চৈতন্যে 'সমাজ' নামক উপলব্ধিও মূলত সামাজিক অস্তিত্বেরই প্রতিভাস। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে বিভিন্নভাবে শিল্পের বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনে স্থিরিত করার প্রয়াস চলছে এমন সব ধ্যান-ধারণা, যার সাথে পৌরাণিক মূল্যবোধের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বে যা ছিলো স্বতস্ফূর্ত, বর্তমানে তা-ই অবভাসিত। কুক্রিয়াশীল (reactionary) মানসতা এই পৌরাণিক মূল্যবোধসমূহের 'ইমেজ'কে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য প্রয়াসে মেতে উঠছে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের বিশ্লেষণে সামাজিক প্রেক্ষিতকে গৌণ করে দেখাবার প্রয়াস চলছে। শিল্পের শূন্যতা স্পর্শী সংজ্ঞারোপ, অন্ধকারগর্ভী চীৎকার প্রভৃতির কারণ, মানুষের চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়া, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীর স্থান নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শিল্পকে জীবন-বিমুখ করে তোলা। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিস্তৃতির ফলে শিল্পের ওপরে দেশে দেশে যে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র কুক্রিয়াশীল আচ্ছন্নতা সৃষ্টিরই ফলশ্রুতি, যার সচেতন বা অবচেতন শিকারে পরিণত শিল্পী কিংবা শিল্প।

ফলে শিল্পের প্রচলিত সংজ্ঞারোপে যেমন, তেমনি ব্যতিক্রমী উপলব্ধির ক্ষেত্রেও বিরাটতম ফাটল লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা শিল্পের মৌলিক স্পন্দনকে স্তব্ধ করে দেয়, হত্যা করে শিল্পকে। এ প্রয়াস অবশ্য নতুন নয়। শিল্পের বস্তুগত আলোচনা অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের সাথে শিল্পের বিশ্লেষণের নতুনতম পথের যেখান থেকে শুরু, যখন থেকে শুরু, তখন থেকেই পাশাপাশি, এই প্রতিরোধী প্রকল্প চালু হয়েছে, যে প্রকল্প শিল্প সম্পর্কিত অন্ধ ধারণা জিইয়ে রেখে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার গোপনতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সত্য, এই বহুবিধ বাধা অতিক্রম করেই শিল্পের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। এটা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা এর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি এতো প্রবল এবং এর মূল শেকড় এতোদূর পর্যন্ত সমাজ-ভূমির গভীরে নিহিত যে, তা আপনিই জেগে ওঠে, বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হয়ে যায়; যুগে, যুগান্তরে। এ কারণেই বারবার, পুনর্বার বহুমুখী ধ্বংসযজ্ঞের পরে আলোড়ন-বিলোড়ন, উত্থান-পতনের পরেও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়নি, কোনো না কোনো ভাবে তা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। দেখা যায়, শিল্পকর্মের সেই সবই যুগান্তরে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে, যার সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় ও ঋজু, যা জীবন কল্যাণের সপক্ষে বলিষ্ঠতর উচ্চারণে নির্দ্বিধ। এ ক্ষেত্রে শিল্পের উদ্দেশ্যমূলকতার প্রশ্ন এসে যায়। কেননা শিল্প যদি জীবন কল্যাণের সপক্ষে কাজ করে, তা হলে তার শিল্পমানতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে বলে অনেকের ধারণা। তাঁদের মতে, শিল্প কখনো উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না, শিল্পীও পারে না উদ্দেশ্যের শিকারে পরিণত হতে। শিল্প, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত, ফলে উদাসীন, নির্লিপ্ত। 'জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী' শিল্পের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা তা-ই। শিল্প উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার অর্থ তার 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী' খসে পড়া।

এই ধারণা শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাস্তব, এমনকি শিল্প-সম্পর্কিত মৌলিক ধারণারও বিরোধী। কোনো কিছুই নিরবলম্ব কিংবা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। শুধু মাত্রাজ্ঞানের ব্যবধান অথবা অসমতা থাকতে পারে। যদি ধরা হয়, শিল্প, শিল্পীর আনন্দের জন্যে, তাহলেও সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের ধারক

শিল্পী নিজে। আর ব্যাপকতম অর্থে শিল্প ব্যক্তির, সমাজের, জীবনের। শিল্পের জন্য শিল্প কিংবা জীবনের জন্যে শিল্প যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, আসল কথা এ ব্যাপারে শিল্পীর ভূমিকার ওপরই পুরো অবস্থা নির্ভরশীল। শিল্পী জীবনকে কীভাবে দেখেন, সমাজকে কীভাবে দেখেন, তা তাঁর আত্ম-উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর পক্ষে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা শিল্পী অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নন। যেখানেই স্পন্দন, গতি, সংঘর্ষ, উদ্যম, চিন্তা, কাজ, সমাজ; সেখানেই, সেই কেন্দ্রীয় ভুবনেই তাঁর অধিবাস। সমাজের সাথে একজন সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক, সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব, শিল্পীর সম্পর্ক এবং দায়িত্বও তা-ই, শুধু মাত্রার তারতম্য। সত্য, শিল্পীর শৈল্পিক মুহূর্ত, তাঁর উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই পার্থক্য কি উভয়ের মধ্যে এমন যোজন দূরত্ব সৃষ্টি করে, যা ধরা-ছোঁয়ার অনেক বাইরে। শিল্পী যা সৃষ্টি করেন, তা অবশ্যই বায়বীয় নয়। তার আত্মঅধিকৃত, সুরেখ এবং স্বতন্ত্র উপলব্ধির, অনুভবের ফসল যে শিল্পকর্ম তা বাস্তবেরই প্রতিকৃতি-বিকল্প, অন্যতর ভুবন নির্মাণ, যা শিল্পীর হৃদয়-নিভৃতে সং-গোপনে পাপড়ি মুদে রাখে। যখনই বহির্দশা, সমাজের ঘাত প্রতিঘাত মানবিক দ্বন্দ্ব সংশয় প্রভৃতি এসে সেই নিভৃত পাতার ভেতরে হাওয়ার চলাচলের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে, তখন শিল্পের প্রয়োজন তীব্রতা পায়, প্রসব হয় শিল্পকর্মের। শিল্পী কি ইচ্ছে করলেই একে এড়াতে পারেন? পারেন না। এ পর্যন্ত এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি, যা এর সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি-যোজনায় সমর্থ। হতে পারে, শিল্পী এমন বিষয় বেছে নিতে পারেন, এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন, যাদের সাথে মানুষের প্রতিদিনের দেখার বিষয় কিংবা চরিত্রের মিল নেই। শিল্পকর্ম, সে যে কোনো শাখারই হোক না কেন, স্বেচ্ছাচারী, নিয়ম না-মানা, অবাধ্য, উচ্ছৃংখল, চরিত্রহীন ও বদমাশ, তাতেও কিন্তু এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, সে সব সমাজ বিচ্ছিন্ন, জীবন-বিচ্ছিন্ন। আসলে সে হচ্ছে অন্য-রকম করে দেখা। সেই অন্যরকম করে দেখার ভেতরে শিল্পী প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিনের আত্মউপলব্ধি থেকে বিকল্প জগত নির্মাণ করেন। সেই জগতের

চেহারা এক-একজনের কাছে এক-এক রকম। প্রধানভাবে তা দ্বৈত। ক. সুন্দর খ. অসুন্দর। যাঁদের ধারণা, শিল্পকর্ম যা, তা অবশ্যই সুন্দর, তাঁরা শিল্পের মৌলিক দিকটিকেই স্পর্শ করে থাকেন। কিন্তু এর পাশাপাশি শিল্পে অসুন্দরের দিকটিও এসে যায়। কেননা শিল্পে প্রচলিত ইমেজ-এর যে ব্যাপারটি রয়েছে, শিল্পকর্মের স্বার্থেই তা ভেঙে দেয়া প্রয়োজন। অনেক সময় অপেক্ষাকৃত গৌণ শিল্পীও শিল্পের বহির্জগতে আত্ম-আসন অধিকৃত করে নেন, যদিও সে আসনের স্থায়িত্ব সুনির্ধারিত নয়। বিশেষত বুর্জোয়া প্রচারণা, কুক্রিয়াশীলদের সৃষ্ট আচ্ছন্নতা প্রভৃতির ফলে জীবন-বিরোধী, দায়িত্বহীন অনেক রচয়িতাও 'শিল্পী' শিরোপা ম্যানেজ করে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জীবনবিরোধিতার প্রসঙ্গটি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরা এই শব্দ প্রয়োগের বিরোধী, তাঁরা বলবেন, কোনো শিল্পীই জীবনবিরোধী নন। কোনো না কোনো জীবন শিল্পকর্মের বিষয় হতে পারে। সত্য, পারে। কিন্তু কীভাবে? অবশ্যই ব্যাপকতম জীবনের বিরুদ্ধে না গিয়ে, তাদের ক্ষতি না করে। শিল্পীর দায়িত্ব এই কেন্দ্রে বন্দী। যদি মুষ্টিমেয় লোকের জীবন-চিত্রণ বৃহত্তর অংশের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে তা অনিবার্যভাবেই অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। শিল্পী জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে কিছুতেই মানবকল্যাণের বিরোধী হতে পারেন না। পারেন না সময়ের, সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। যদি তিনি তা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আছেন, যা অনিবার্যভাবেই তাঁর পতন ডেকে আনবে। শিল্পকর্মে টিকে থাকা না-থাকার ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবেই সময়ের ওপর নির্ভরশীল। এজন্যে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু অনস্বীকার্য, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারটি তাঁর সমসাময়িক উপলব্ধি কিংবা তার আত্ম-প্রকাশের ওপরই নির্ভর করে। সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা নির্ভর করে তার শিল্পমানতার ওপরেই। কিন্তু কোনোক্রমেই তা তাঁর-বিষয় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণকে এড়িয়ে নয়। বস্তুত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটিই শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের সাথে জড়িত। যদি এমন হয়, শিল্পী প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে যা দেখছেন, যা অনুভব করছেন, উপলব্ধি করছেন; তাকে

এড়িয়ে, লুকিয়ে, ঢেকে রেখে প্রকাশ করছেন সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্পী সামাজিকভাবে শুধু দায়িত্বহীন নন, অপিচ বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মপ্রতারক। বোদলেয়ার যে জীবনকে স্পর্শ করেছেন, সমস্ত জীবনকে যেভাবে নেতিবাচক দিক থেকে অবলোকন করেছেন, তাঁর কবিকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটেছে অবিকলভাবে। তা সত্ত্বেও তিনি বিতর্কিত। কেননা তিনি জীবনের অন্ধকার দিক ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। কাফ্কা কিংবা র‍্যাবো অথবা এজরা পাউণ্ডও জীবনকে অস্বাভাবিকভাবে দেখেছেন, হতাশাগ্রস্ত, অন্ধকারস্পর্শী, জীবনবিমুখ হয়ে। এঁরা সকলেই বিশ্বস্বীকৃত প্রতিভা তা সত্ত্বেও। তার কারণ, আমার মনে হয়, তাঁদের স্বীকৃতিতে বিষয়কে তেমন বড় করে দেখা হয়নি, যতোখানি দেখা হয়েছে শৈল্পিক মান। অথচ এঁদের একজন অবক্ষয়ের আবর্জনায় নিমগ্ন শব্দের জনক, একজন ফ্রান্সের সেই আত্মহননী কথাশিল্পী, একজন কবিতাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিশেবে মেনে না নেয়া শিল্পের জগত থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত তরুণ কবি; আর একজন ফ্যাসিবাদের সপক্ষে সোচ্চার, দুর্বোধ্য ও বিতর্কিত কবি-গুরু। বলার অবকাশ রাখে না, একজন শিল্পীর আত্মহননের পথ বেছে নেয়া, শিল্পের জগত থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন, ফ্যাসিবাদের সপক্ষে সোচ্চার হওয়া কিংবা শিল্পকর্মে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি তাঁদের জীবন বিমুখতা কিংবা শুদ্ধতা ও সুন্দরের বিরোধিতারই বহিপ্রকাশ। কিন্তু যেহেতু এই সামগ্রিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে তাঁদের জীবন কেন্দ্রেই বন্দী, সেহেতু এঁদের শিল্পী পরিচয় স্বীকৃত।

সত্য, ব্যক্তির দুঃখবোধ, হতাশা, জীবন-বিমুখতা প্রভৃতি শিল্পের বিষয় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংহতি ও পরিমিতিবোধ সম্পর্কে শিল্পীর সচেতনতা থাকা দরকার। যদি শিল্পী তাঁর ব্যক্তিক দুঃখবোধ ও হতাশাকে বৃহত্তর পটপ্রেক্ষায় ছড়িয়ে দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত ও আক্রান্ত করেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য অ-মহৎ বলে ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। কেননা ব্যক্তিক দুঃখবোধ ও হতাশার সাথে শিল্পীর একাত্ম হওয়া এক কথা, তার দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভিন্ন কথা। বলার অবকাশ রাখে না, উল্লেখিত কবিদের ব্যক্তিক জীবন তাঁদের শিল্পী জীবনকে যেভাবে আক্রান্ত করেছে, তা

যে কোনোভাবেই হোক না কেন, অবশ্যই শিল্পীর দায়িত্বের পরিচয় যেমন বহন করে না, একই সঙ্গে যাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত হন, তাঁদের আত্ম-বিশ্বাসের ফাটল সম্পর্কেও দ্বিধার কোনো অবকাশ থাকে না।

সত্য, যিনি যথার্থই শিল্পী, তাঁর শিল্পকর্ম কিছুতেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন ও দায়িত্বহীন হতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো যুগের, যে কোনো কালের শিল্পকর্ম, যা মহৎ শিরোপা লাভে সমর্থ, তার অন্তর্বৃত্তে শিল্পীর সেই হৃদয়-স্পন্দন ধ্বনিত, যা মানুষের কল্যাণ ও মানবতার দৃঢ় উচ্চারণে সোচ্চার। এমন অবশ্য হয়, শিল্পী হিশেবে চিহ্নিত, অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম শিল্প-শিরোপা লাভে সমর্থ কিনা, এইভাবে বিতর্কিত, সেখানে বিষয় গ্রহণে সমাজের সাথে আত্মীয়তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্ম শিল্প না হয়ে ওঠায় তা গ্রাহ্য নয়। অনস্বীকার্য, যা শিল্প, তা অবশ্যই সার্থক। যদিও 'শিল্প কি'—এ ধরনের বিতর্কের ফলে মহৎ শিল্প হিশেবে স্বীকৃত সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। বিপরীতে, অপেক্ষাকৃত গৌণ সৃষ্টিও শিল্প হিশেবে স্বীকৃত। এটি পুরোপুরিভাবেই নির্ভরশীল দৃষ্টিকোণের ওপর। অবশ্য মহৎ সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকে। যদিও সময়ভেদে, কালভেদে তার 'উপযোগিতা'র রূপান্তর ঘটে। যতো বিতর্কই থাক না কেন, মহৎ সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে যে কোনো দৃষ্টিকোণের ধারকই হোন না কেন, মোটামুটিভাবে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হয়। তা না হলে মহৎ সৃষ্টি বলে কোনো কিছুই থাকতো না। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যতর বিতর্ক রয়েছে। যেমন, যাঁরা বিশ্বাস করেন, শিল্পের জন্যে শিল্প (art for art's sake), কিংবা যাঁরা বিশ্বাস করেন, জীবনের জন্যে শিল্প (art for life, sake), তাঁরা দুই বিপরীত মেরুতে বাস করেন। যাঁরা প্রথম মতের সমর্থক, তাঁদের ধারণা, শিল্প যেহেতু সীমাবদ্ধ নয়, সেহেতু জীবনের জন্যে একে নির্দিষ্ট করে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের সংকীর্ণতা কাজ করে। আর যাঁরা দ্বিতীয় মতের সমর্থক, তাঁদের ধারণা, শিল্পের জন্যে শিল্প, এই ধারণা ভাববাদী, বিলাসী, অবাস্তব, অযৌক্তিক ও কুক্রিয়াশীল। শিল্প কাদের জন্যে? নিশ্চই শিল্পের একটা উদ্দেশ্য আছে। যদি তা জীবনের জন্যে না-ই হয়ে থাকে, তাহলে কি তা হাওরায় ভাসমান কোনো

কিছু? কিন্তু প্রথম মতের সমর্থক যাঁরা, তাঁরা এ মতকে খণ্ডন করতে চান এভাবে: শিল্পের চাহিদা নিশ্চই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদার মতো নয়, শিল্পের প্রয়োজনও এতো স্থূল নয় যে, শিল্প কাদের জন্যে তা নিক্তি মেপে দেখতে হবে। এর বিপরীত দিকে পুনরায় এই যুক্তি সোচ্চার হয়ে ওঠে: শিল্পের চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদার মতো নয় বটে, কিন্তু এই অনিবার্য প্রয়োজনগুলোকে অস্বীকার করেও নয়। আসলে শিল্পকে হতে হবে জীবনের প্রয়োজনের (অবশ্যই স্থূলার্থে নয়) সাথে সম্পর্কিত।

প্রকৃতপক্ষে এই পরস্পরবিরোধী মতামতের প্রচলিত ইমেজ বাদ দিয়ে যদি এর গভীরে দৃষ্টি প্রতিফলিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আদৌ নেই। শিল্প অবশ্যই জীবনের জন্যে। কিন্তু শিল্পের জন্যেও বটে। এদের মধ্যে মূলত কোনো কনট্রাডিকশন নেই। কেননা জীবনের জন্যে হয়েও শিল্পের শিল্প হতে বাধা নেই, তেমনি শিল্পের জন্যে হয়েও শিল্পের জীবনের জন্যে হতে কোনো বাধা নেই। দুটো ধারণা আসলে বিচ্ছিন্ন নয়, সম্পৃক্ত। নিছক আত্মস্বার্থের প্রয়োজনে একে স্থূলভাবে কেটেছিঁড়ে ভাগ বসানোর এক ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হয়েছে পূর্বাপর। এ ক্ষেত্রে যে জীবন শিল্পের বিষয় এবং যে শিল্প জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত, তাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন এমন সব লোকেরা, যাঁদের শিল্প সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করার কোনো অধিকারই নেই। বর্তমান বিশ্বে জীবন সম্পর্কে সামাজিক ধারণাসমূহের পরিবর্তন ঘটায় এবং শ্রেণী-ব্যবধানের ব্যাপারটি তীব্রতা লাভ করায় শিল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুনতর চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে শিল্পে শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি তীব্রতা পাচ্ছে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের বিশ্লেষণ হওয়াতে অনিবার্যভাবেই যে কোনো 'জীবন'-এর রূপায়নই গ্রাহ্য হচ্ছে না। ফলে শিল্পে সীমিতি প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এই সীমিতিই সৃষ্টি করছে বিতর্কের। এতে শিল্পীর ওপরে বিধি-নিষেধ ও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। জীবন সম্পর্কিত (সে কল্যাণমূলক হলেও) অবাধ ধারণার আত্ম-প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বলার অবকাশ রাখে না, এটা শিল্পের জন্যে ক্ষতিকর।

শিল্পী অবশ্যই স্বাধীন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নন। জীবন সম্পর্কে উদারমুক্ত ভাবনার প্রকাশ শিল্পীর স্বাধীনতার প্রধানতম শর্ত। কিন্তু তিনি যদি জীবন-বিরোধী হন এবং তাঁর মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ ঘটে, তা কোনোভাবেই গ্রাহ্য হতে পারে না। এটি পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল শিল্পীর দায়িত্বের ওপর। এ ক্ষেত্রে শিল্পী সমাজ অভিমুখী হতে বাধ্য। তাঁর সৃষ্টিকর্ম জীবনের জন্যে, সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক কিনা, শিল্পীকে সেদিকেই সচেতন থাকতে হয়। এ ব্যাপারে শিল্পী পরোক্ষভাবে কিছুটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে গেলেও, একে অস্বাভাবিক বলা চলে না। তার অর্থ এই নয় যে, শিল্পী সীমাবদ্ধতার ভেতরে আত্মসমর্পিত দাসে পরিণত হবেন। এর মধ্যেই শিল্পীকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সৃষ্টির স্বাধীনতাকে গতি দান করতে হবে। মূলকথা, শিল্পীর দায়িত্ব, জীবনকে কল্যাণকর দিক থেকে যে কোনোভাবে রূপায়িত করা।

যতো বিতর্কই থাক না কেন, শিল্পের উদ্দেশ্যমূলকতাকে অস্বীকার করা যায় না। কারো মতে, শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিক আনন্দের জন্যে, কারো মতে, অন্যকে আনন্দ দানের জন্যে। আবার কেউ একে মনে করেন, শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, কেউ মনে করেন, শিল্প সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম। মোট কথা এর একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। শিল্পী নিজে যদি নিজের আনন্দের জন্যে লিখে থাকেন, তাহলে পরোক্ষভাবে তা তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে; যদি অন্যকে আনন্দ দানের জন্যে হয়, তা হলেও তা শিল্পীর নিজের সপক্ষেই কাজ করছে। আর শিল্প শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার বলে যাঁদের ধারণা, তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যাপক, সুবিধা গ্রহণের হাতিয়ার হলে শিল্পী এবং অশিল্পী উভয়েরই লাভ। বস্তুত শিল্পের উদ্দেশ্য-মূলকতার প্রশ্নটি খুব স্থূল ও সুবিধাবাদী কনটেক্সটে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসলে শিল্পের উদ্দেশ্য কিছুতেই স্থূল হতে পারে না। শিল্প যদি মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ হতে বাধ্য। কে কীভাবে ব্যবহার করছে, সেটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার সাথে শিল্পের অন্তর্গত ও বহির্গত কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্পীর মৌলিক দৃষ্টিকোণের ওপরে তা নির্ভর করে। শিল্পী যদি হন এ জাতীয়

যে কোনো মতের ধারক, তাহলে 'শিল্পকর্মে'ও এই বিচ্যুতি থাকতে বাধ্য। অবশ্য তাকে শিল্পকর্ম হিশেবে আখ্যায়িত করা সম্ভব কিনা, তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আশার কথা, যা শিল্প (art), তা কখনো এসব সংকীর্ণতার ছোঁয়ায় কলুষিত হতে পারে না। তা তার অন্তর্নিহিত দ্যোতনা নিয়ে জেগে ওঠে। যাঁরা এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসী, তাঁরা সমাজ-মৃত্তিকার গভীরে নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে প্রোথিত করে দেন, নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে এতো বেশী সচেতন হয়ে ওঠেন, যা তাঁদেরকে সেখানেই সংস্থিত করে রাখে। পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান সত্য, কিন্তু বিমুক্ত-উদারতায় নয়, সংযুক্ত-অন্ধতায়। ফলে সমাজ সেখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, শিল্প গৌণ হয়ে যায়। এই দু'টোকে সংযুক্ত করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরাই শিল্পী। শুধু এদিক কিংবা ওদিক নয়, এদিক ওদিক-এর মিলনের যাঁরা যথার্থ কারিগর, তাঁদের হাত থেকেই বেরিয়ে আসে শিল্পকর্ম।

লক্ষণীয়, এ পর্যন্ত শিল্পের যে ইতিহাস, তার ব্যাপকতম সার্থকতা ঘটেছে বুর্জোয়া মানসতার ধারকদের হাতে। তাঁদের দেখা ও রেখা সেই মানসতাকেই বিম্বিত করেছে। সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকে তাঁরা যা করেছেন, তা তাঁদের সমকালীন পটভূমিতে বিশ্লেষিত হলে, শিল্প সম্পর্কিত বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। যাঁরা শিল্পের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে বিশ্বাসী, এ সম্পর্কে তাঁরা যদি সুনির্দিষ্ট ধারণায় আত্মস্থ না হন, তা হলে শিল্পের মূল্যায়ন যথার্থ হতে পারে না। যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ কি, তাঁদেরকে একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে, তা হলো: সমাজ প্রেক্ষিতে, সময়ের পটভূমিতে বিচার করা। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় একজন শিল্পী যদি সেই সমাজ-অতিক্রমী কোনো সৃষ্টিকর্ম উপহার দিতে না পারেন, তাহলে তা সেই শিল্পীর জন্য খুব অস্বাভাবিক না-ও হতে পারে। যদি কোনো শিল্পী তা পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, সামাজিক বিবর্তনে অর্থাৎ সমাজ-প্রগতির সাথে তাঁর আত্ম-সংযোগ গভীরতর। এটা একজন শিল্পীর জন্যে গৌরবের। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এটা নয় যে, এভাবে শিল্পীর দায়িত্বকে সমাজ থেকে

আলাদা করে দেখা হচ্ছে। সমাজ-প্রগতির সাথে যে শিল্পী তাল মেলাতে অক্ষম, তিনি আসলে যথার্থ শিল্পী কিনা, এটা অবশ্যই ভেবে দেখবার বিষয়। কিন্তু বুর্জোয়া শিল্পী, যাঁদের অনেকে যুগাতীত অনুভবে গভীরতা-স্পর্শী নন, তাঁরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিত্যাজ্য হতে বাধ্য। অথচ তাঁরা তাদের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন!

প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবেই শিল্পীর ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ক্ষমতা? অবশ্যই তাই। কেননা যে কোনো একজন ব্যক্তি সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেই শুধু হয় না। যেহেতু প্রশ্নটি শিল্পের সাথে জড়িত, সেহেতু তার শিল্পমানতার ব্যাপারটি অনিবার্যভাবেই এসে যায়। আর শিল্প মানেই তো ক্ষমতার দরকার, প্রতিভার (যে কোনো অর্থেই হোক না কেন) দরকার। এটা সবার হয় না। বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাপকতর জনগণের হৃদয় প্রতিবেদন, তাদের কল্যাণের সপক্ষে বলিষ্ঠ উচ্চারণ, যার সাথে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নটি জড়িত, তাকে শিল্পমর্যাদা দান, এটা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার। গোর্কি, মায়াকোভস্কি, পাবলো নেরুদা, পিকাসো, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিংবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অসাধ্য সাধন করেছেন। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেও যাঁরা বিষয়কে শিল্প মর্যাদা দান করতে পেরেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের সামনে তাঁরা অবশ্যই ঋজু ও সুরেখ প্রতিবাদ হিশেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা ভিন্নতর ভাবনায়, আত্মসর্বস্ব সুবিধাবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছেন, শিল্পের বাজারে যাঁরা জোর করেই একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটাতে চান, উল্লেখিত শিল্পীরা নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও এই বিকাশের বিরুদ্ধে কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করেছেন, যা শিল্প ও শিল্পীর পথ বন্ধনহীন আনন্দ ধারায় ভরে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে। ভবিষ্যত শিল্পের গতিধারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কবি : ব্যক্তি ও শিল্পী

'কবিরে পাবে না তাঁর জীবন-চরিতে'-রাবীন্দ্রিক এই মর্মবাণীকে সাধারণভাবে সত্য বলে মেনে নেয়া হলেও, আসলে এর যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কেননা, সাধারণভাবে কবির জীবন-চরিতে কবিকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে এটা বলতেই হবে, মূলত কবির মানস দর্পণ তাঁর জীবন-দর্পণেরই শিল্পিত রূপ মাত্র। কবি ব্যক্তি ও কবি শিল্পীর মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবধান থাকলেও প্রকৃত অর্থে এঁদের সম্পর্ক খুব গভীর। সত্য, ব্যক্তি হিশেবে কবির প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি উপলব্ধি শিল্পের আওতায় না-ও পড়তে পারে। কিন্তু তা এ সত্য প্রমাণ করে না, কবি তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কবি যেমন সমাজ বিছিন্ন নন, সমাজের উত্থান পতনের আওতা-বহির্ভূত নন, তেমনি তিনি ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক উত্থান-পতন-বহির্ভূতও নন। ব্যক্তি সমাজের ভিত্তি, বিন্দু বিন্দু জল। আর এই বিন্দু বিন্দু জলের বিস্তৃতির নামই সমুদ্র। সমুদ্রে যেমন বিন্দু বিন্দু জলের শব্দ জাগে, তেমনি বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধুর কল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়। জীবনের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রেও কি এই সত্য অস্বীকৃত? না। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এই মৌলিক সত্য সন্ধানে আগ্রহী হলে দেখা যাবে, বিশ্বের কোনো কবিই তাঁর ব্যক্তিজীবনের বাইরে থেকে শিল্পের বা কবিকর্মের সার্থকতা আনতে পারেননি। শুধু তাই নয়, আসলে কোনো কবিই ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করতে পারেন না। তাঁর সৃষ্টিকর্মে কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তিজীবনের প্রতিভাস ঘটতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কবি পরস্পরে, অনুভবের ভিন্নতার কারণে জীবন-প্রতিভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, সুস্পষ্ট হতে পারে, অস্পষ্ট হতে পারে না কিছুতেই। যদি তা হয়, তাহলে

বুঝতে হবে, তিনি মূলত কবি নন, প্রতারক। কবি-ব্যক্তি যা ভাবেন, যা অনুভব করেন, এমন কি যে আচার-আচরণ করেন, কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটে। শব্দ সেখানে সৌন্দর্য বিচার করে ব্যবহৃত হয়। সেটা ভিন্ন কথা। কারণ, যে কোনো শিল্পের মৌলিক শর্ত সুন্দরের সাধনা, পরিমিত ও অনিবার্য শব্দের যথাযথ ব্যবহার। এর ব্যতিক্রম শিল্পকে খণ্ডিত করে, শিল্পের সৌন্দর্য ব্যাহত করে। কবিতার বিষয় হতে পারে যে কোনো-কিছু ; কিন্তু তার উপস্থাপনই আসল কথা। লক্ষণীয়, কবিতার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে উদারতার যে দৃষ্টিভঙ্গী, তা অবশ্যই ভিন্নতর অর্থে। মানুষের কল্যাণ ও মানবতাকে সামনে রেখে কবিতায় যে কোনো বিষয়বস্তু গ্রহণ সকলেরই কাম্য। এর বাইরে যাঁরা অন্য কোনো কিছুকে কবিতার বিষয় হিশেবে বেছে নেন, তাকে আপাতদৃষ্টিতে স্বীকার করে নেয়া হলেও সে ক্ষেত্রেও কবির ব্যক্তিজীবনের সাথে তার কবিতার সম্পর্কের সত্যতাকেও না মেনে উপায় নেই। যেমন বোদলেয়ার। এক চূড়ান্ত অবক্ষয় ও অন্ধকারের পাঁকে আবর্তিত এই কবির জীবনের সাথে তাঁর কবিতার কোনো বিরোধ নেই। বোদলেয়ারের কবিতা পড়ে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে। তাঁর কবিতার মধ্যেই তাঁর জীবনের প্রকৃত চেহারা সুস্পষ্ট। এ কবির বিষয়বস্তু অবশ্য জীবন-বিরোধী। কিন্তু তিনি আত্মপ্রতারক নন। বোদলেয়ারের জীবনাচরণ, তাঁর অনুভব-উপলব্ধির সাথে তাঁর কবিতার কোনো ব্যবধান নেই। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, কবিতায় তাকেই প্রতিফলিত করেছেন। এই প্রকাশে বোদলেয়ার দ্বিধাহীন। কিন্তু বোদলেয়ারের এই দ্বিধাহীন আত্মপ্রকাশ সকল কবির কবিতায় নেই। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনকে অস্বীকার করতে চাইলেও কবিতা কাউকে রেহাই দেয় না। অজস্র পুণ্যের ভারে পূর্ণ হয়ে যাওয়া পাত্রেই পাপের কালিমা জেগে ওঠে। এটা অলৌকিক নয়, অনিবার্য। কারণ কবির ভেতরে যে ব্যক্তি বাস করে এবং ব্যক্তির ভেতরে যে কবি বাস করে, তাঁরা এক নিবিড় ঐক্যসূত্রে জড়িয়ে থাকেন, যা শাদা চোখে দৃষ্টির আওতায় পড়ে না ; অথচ সূক্ষ্ম অনুভবের লেন্সে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসেই।

অনেকের ধারণা, কবির নিজস্ব জগত, যা সম্পূর্ণই বাস্তবতা-বিমুক্ত, তাতে কবির ব্যক্তিজীবন নয়, সমাজের বিভিন্ন দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। আর সেই অন্তরতম জগত থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় শব্দে তার নামই কবিতা। এই ধারণা যেমন পুরোপুরি সত্য নয়, তেমনি পুরোপুরি মিথ্যেও নয়। সত্য, কবির নিজস্ব জগত কবিতার জন্ম দেয়; তার সাথে বাস্তবতার মিল নেই। কিন্তু তা অবশ্যই বাস্তবতা-বিমুক্তও নয়। একে বরং বলা ভালো, বাস্তব জগতের বিকল্প। বাস্তব এবং কল্পনাকে নিয়েই তা এক আশ্চর্য জগত। এখানে সমাজ এবং তার বহুবিধ ছায়ার প্রতিফলন যেমন সত্য, তেমনি ব্যক্তি এবং কবি ব্যক্তির জীবনের বিচিত্রতম প্রকাশও সত্য। যাঁরা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ কবিতাকে এক স্বর্গীয়-প্রাপ্তি বলে মনে করেন, তাঁরা বিভিন্ন কারণে কবি ব্যক্তি ও কবি শিল্পীকে পৃথক করে দেখেন। এ দু-এর মধ্যে পার্থক্য কবিতার সত্য ও বাস্তব সত্যের ব্যবধানের মতোই। এ ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা সর্বগ্রাসী নয়, যতোটা সর্বগ্রাসী এদের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তার প্রতি অস্বীকৃতি। তাঁদের এই অস্বীকৃতির পেছনে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ও একক সাধারণ ধারণাই নয়, কুক্রিয়াশীল (reactionary) ও অসাধারণ ধারণাও সক্রিয়। যাঁরা এই প্রেক্ষিত থেকে কবির জীবন ও শিল্পকে পৃথক করতে চান, তাঁদেরকে অবশ্যই চিনে রাখতে হবে। এঁরা এই মৌলিক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে চান, কবিতা তথা সাহিত্যে যে বাস্তবতার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তাকে প্রতিহত করে শোষণের বিস্তৃতি ঘটানোর জন্যে। দেখা যাবে, এ জাতীয় প্রচারণা পুঁজিবাদী দেশের সাহিত্যের প্রধানতম হাতিয়ার। আর যাঁরা সাধারণভাবে এই ধারণার শিকার, তাঁরা নিসন্দেহে বিভ্রান্ত। এঁরাও পরোক্ষভাবে, জেনে না-জেনে হৃদয় নিভৃতে পুষে রাখছেন শিল্প সম্পর্কিত সামন্ত ধারণা। অথচ হাজার বছর আগে চর্যাপদে যখন আধুনিক ধারণা বলতে কিছুই ছিলো না, যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individualism) প্রশ্ন ছিলো না; তখনও কবি তাঁর ব্যক্তি-জীবনের মর্মবাণীকে অপ্রকাশিত রাখতে পারেননি। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী/হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী' কবির এই পংক্তি কি

শুধু তাঁর দূরাবলোকন? একি কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতারই বেদনার্ত ভাষা নয়? কিংবা আরো পরে ভারতচন্দ্রের সেই বিখ্যাত পংক্তি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' শুধুই কি তাঁর কাব্যের অমর চরিত্র ঈশ্বরী পাটনীর আকাঙ্খার প্রকাশ? এর অন্তরাল থেকে কি বেরিয়ে আসেন না সেই ব্যক্তি, যিনি শুধু মাত্র কবি নন, রক্তে-মাংসে গড়া আর দশজনের মতোই একজন সাধারণ মানুষ?

স্বীকার্য, সমাজপ্রেক্ষিত, রাষ্ট্রীয় স্থিরতা-অস্থিরতা, আর্থিক অসঙ্গতি প্রভৃতির ফলে কবির আত্মপ্রকাশের চেহারায় ম্লানতা থাকে। প্রাচীন কবিতার অস্পষ্টতার অন্তর্নিহিত কারণও তা-ই। রূপক কিংবা প্রতীক সেখানে প্রধান। দেব-দেবীর গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্পের প্রকাশ ছিলো সেখানে সাধারণ নিয়ম। এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য কিংবা বিতর্করহিত নয়। কিন্তু অনুমান দুঃসাধ্য নয়, প্রধানত রাজনৈতিক কারণ এবং সংস্কার এই আড়ালের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে টেনে এনেছে। তা সত্ত্বেও সেখানে দেব দেবীর গুণকীর্তনের মধ্যে দিয়ে যে সুস্পষ্ট কাহিনী বেরিয়ে এসেছে, তাকে মানবিক মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই দেখা যাবে, কবির জীবন ঐ কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

মূলত এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক নিয়মেরই ধারাবাহিক ফলশ্রুতি। এর অন্তর্নিহিত গতিময়তায় বিজ্ঞানের ধারা অনিবার্যভাবে মিশে গেছে। কবিতায় যে চৈতন্য-প্রবাহের কথা বলা হয়, তা সমাজপ্রবাহের সাথেই পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। কবি এই সমাজ-প্রবাহের ধারক, তাঁর অভিজ্ঞতা মিথ্যে হবে কেন? ব্যক্তি হিশেবে তিনি যা অনুভব করেন, উপলব্ধি করেন, তাঁরই প্রকাশ ঘটে কবিতায়। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয় তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণের বহুবিধ প্রক্রিয়া, যাকে ইচ্ছে করলেই সরিয়ে দেয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের যে ইমেজ আমাদের সামনে উজ্জ্বল কিংবা শৈশব থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে জীবনকে আমরা জানি, তাঁর সেই ব্যক্তিচরিত্রের সাথে কবিতার চরিত্রের কোঁনো ব্যবধান আছে কি? কিংবা নজরুলের ওলট-পালট জীবনের সাথে তাঁর

কবিতার ওলট-পালটের? আমার মনে হয় নেই, থাকতে পারে না। কোথাও কোথাও হয়তো তিনি আশ্চর্য রকমের শান্ত, উদাসীন, কোথাও বা রাগী, ভাঙনমুখী, উত্তপ্ত। আবার কোথাওবা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নজরুলের জীবনও কি এই একই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয় না?

কবিতা যেহেতু বিলাস নয়, কল্পনার বন্ধনহীন শূন্যতা নয়, সেহেতু ব্যক্তি-জীবনের সাথে এর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক স্বীকৃত। একে কোনোভাবেই নির্বাসিত করা অসম্ভব। একটা সময় ছিলো, যখন শুধু কবিতা নয়, সকল রকমের শিল্পকে কল্পনার জগত থেকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চলতো। 'স্বভাব কবিত্ব'-এর স্বীকৃতি তখন ভিন্নতর মর্যাদা পেতো। কিন্তু এখন বিশ্লেষণের ধারা বদলে গেছে। বিশেষত বর্তমান বিশ্বের যে প্রবণতা, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের বিচার বিশ্লেষণ; তা কখনো অযৌক্তিক বিশ্লেষণকে স্বীকার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জীবন ও জগত, শিল্প ও শিল্পীকে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত করাতেই মৌলিকতা। সে প্রেক্ষিতে কবির জীবন কবিতার জন্যে একটা বড় ফ্যাক্টর (factor)। কবির লিখিত জীবনীতে কবিকে পাওয়া না গেলেও, কবির জীবনে তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ জীবন-চরিত অর্থ জীবনীর সীমাবদ্ধ বৃত্তকেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি একে কবি-জীবনের অভ্যন্তরে বিস্তৃত করে দিয়েছি। আর সে কারণেই কবির জীবন থেকে তাঁর কবিতাকে এ-ক্ষেত্রে ভিন্ন করে দেখা যেতে পারে না। বলার অবকাশ রাখে না, রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ বৃত্তকেই বোঝাতে চেয়েছেন অর্থ এই নয় যে, তিনি এর গভীরতার দিকটি উপলব্ধি করেননি। তিনি নিজের জীবনে যেমন এই গভীরতার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছেন, তেমনি কবিতার নিভৃত বাসরে বহু বিচিত্র ক্যানভাসে জীবনকে এনে দাঁড় করেছেন। কিন্তু 'কবিরে পাবেনা তাঁর জীবন চরিতে' এই পংক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একটি বিশেষ দিকের প্রতি সচেতন অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। আমি শুধু অন্য একটি দিকের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টি প্রতিফলিত করেছি।

স্বীকার্য, এ ধরনের ভিন্নমুখিতা রয়েছে বলেই শিল্পের বৈচিত্র্য রয়েছে, যেমন

রয়েছে জীবনের। প্রতিটি চেতনার কেন্দ্রবিন্দু যদি এক হতো, তাহলে শিল্পকর্ম নিয়ে নতুনতর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতো না। যাঁরা শিল্পে ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলনের ঘোরতর বিরোধী কিংবা যাঁরা এর সপক্ষে, তাঁরা দু'টি বিপরীত মেরু থেকে একটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করেন। এর কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারা ও প্রবহমানতা থেকে তা যদি স্থির না করা যায়, তবে ব্যর্থতার দায় এসে পড়বে দায়িত্বশীল পাঠকদের ওপরে, সচেতন জনগণের ওপরে। এবং এটা অনিবার্য, জীবনের সপক্ষে সোচ্চার-মানসতা এই অবশ্যম্ভাবী সত্য আবিষ্কারে কখনো ভুল করবে না।

এটা ইতিহাসের পরিণতি। জীবনকে বাদ দিয়ে কবিকর্ম কিংবা শিল্পকর্ম কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। এ সত্য শুধু অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন সম্পর্কেই সত্য নয়, কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও সত্য। মূলত এটি নির্ভরশীল কবির ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণের ওপর। তিনি যদি জীবন বিরোধী হন, তাঁর কবিতার মধ্য থেকে তা অবশ্যই প্রমাণ হিশেবে বেরিয়ে আসবে। তার বিপরীত হলে, তা-ও। অর্থাৎ কবি, যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, কবিতার শব্দগুচ্ছে ফুটে উঠতে বাধ্য। অনিবার্য নিয়তির মতো কবিকে জীবনের জলের আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরে আসতে হয়। এ কারণেই কবি-ব্যক্তি ও কবি-শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান মূলত গ্রাহ্য নয়, সাধারণভাবে স্বীকার্য মাত্র, যা কবিতা কিংবা জীবন বিশ্লেষণের পক্ষে মারাত্মক কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ।

কবিতা কল্পনালতা সত্য, কিন্তু এই সত্যতার শেকড় প্রোথিত সেই মৃত্তিকায়, যা জীবনের রস শুষে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়। চেতনার বা উপলব্ধির যে নিভৃত জগত গড়ে ওঠে নিজের ভেতরে, তা জীবনের গোড়া থেকেই উৎসারিত হয়। কবি ব্যক্তি হিশেবে যেমন, শিল্পী হিশেবেও তেমনি এই উৎসারণের মর্মমূলে দাঁড়িয়ে আছেন। আর এই মর্মমূলের সঙ্গীতই কবিজীবনের মৌল প্রার্থনা, ব্যাপকতম জীবন-সাধনার স্বীকৃত সত্য।

কবিতায় বাস্তবতা ও ভিন্নতর অবলোকন

কবিতা কি অলৌকিক মনোলতা, যা স্বপ্নের বৃক্ষ বেয়ে বেয়ে ক্রমাগত ঊর্ধগামী হয়? কিংবা কবিতা কি তাই, যা আলোছায়ার মায়াবী কপাট উন্মোচন করে অচেনা সম্রাজ্ঞীর মতো মনোদরজায় এসে আঘাত করে? অথবা এ কি কোনো অবাক আলোকরশ্মি, যা কল্পনার নদীতে তরঙ্গ তুলে চেতনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক অচেনা বন্দরে? সুনির্ধারিতভাবে কবিতার এমত চিহ্নন অসম্ভব। তবুও সত্য, কবিতা, এই অক্ষর তিনটি উচ্চারণের সাথে সাথে এক বাঁধনহীন নিয়মবন্ধন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাঁধনহীন নিয়মবন্ধন স্ববিরোধিতা হিশেবে কারো কারো মনোগোলকে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এ শব্দ সত্য গ্রাহ্য এ কারণে যে, কবিতার পেছনে নিয়মবন্ধন থাকলেও তা সর্বগ্রাসী নয়। কেননা তা শুধু হতে পারে বাঁধনহীন। এ যেন খাঁচার পাখি। ছেড়ে দিলে উড়ে বেড়াবে, কিন্তু হারিয়ে যাবে না। ফিরে আসবে নিজের খাঁচায়। পাখির ফেরাটা অনিবার্য নয়, তবুও তার ফিরে আসার নেপথ্যে নিয়মবন্ধন ঐ খাঁচা। যাঁরা এই বাঁধনহীন নিয়মবন্ধনকে স্বীকার করেন না, তাঁরা কবিতার প্রাণসত্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চান। হৃদয়ের প্রতিধ্বনিকে আলাদা জগতের মধ্যে পুরে দিতে চান। অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা কবিতার অন্তর্বৃত্তে বাস্তবের প্রতিধ্বনিকে অস্বীকার করতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অস্বীকৃতির এই প্রচেষ্টা কি সার্থকতা লাভ করতে সক্ষম হয়? হয় না। কেননা কাব্যের পুর্বাপর ধারণা এই অস্বীকৃতির বিপক্ষে।

চর্যাপদ কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী লিখিত হয়েছিলো কেন? তার মৌল চেতনা কোন দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেছে? চর্যাপদের সাধনা বৌদ্ধ

সাধনাচার্যদের গুহ্যতত্ত্বের সাধনা হলেও তা কি আধ্যাত্মিকতার গগন স্পর্শ করে ক্রমাগত শূন্যতায় ভাসমান হয়ে পড়েছে? উপরার্থ তাই বহন করে। কিন্তু মর্মার্থ? তার মধ্য দিয়ে যে চিত্র বা জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তার সাথে অলৌকিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে জীবন, যে জীবন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থাকেই দর্পিত করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য থেকেও যে চিত্র প্রতিবেদিত হয়েছে, মরমীয়া সাধকদের বহিরার্থ সেখানে মূল সত্য নয়, মূল সত্য তার অন্তরাল-ভেদী জীবন-ভাবনার বিকল্প প্রয়াস।

অতএব কবিতাকে বাস্তব জীবনের শিল্পিত অনুকৃতি হিশেবে চিহ্নিত করাই যথার্থ। যাঁরা এর বিপরীতে ভিন্নতর স্রোত-প্রবাহের গতিদানে সচেষ্ট, তাঁরা যুগ-সত্যকে অস্বীকারেও অগ্রগামী। এ লক্ষণ একমাত্র জীবন বিরোধী চেতনা-শেকড়ে রস সঞ্চালনের প্রচেষ্টা উদ্ভূত। কবি কি অলৌকিক জগতের অধীশ্বর? তিনি কি তবে বাস্তব সংঘাতের নিষ্ঠুর সত্যের চেয়ে কুয়াশাঘেরা পরিপার্শ্বের দিকে অতিমাত্রায় নিমজ্জিত? তাঁর চারদিকে যে চলমান জীবন-স্পন্দন, তা কি তবে অবাস্তব, মিথ্যে? যাঁরা কবিতাকে বাস্তবতা-বিচ্যুত অন্তর প্রেরণার প্রকাশ বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে এ জীবন-স্পন্দন অবাস্তব, মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে পারে। সন্দেহ নেই, এ জাতীয় বোধ তাঁদেরই নাভিমূলে কিলবিল করে উঠতে পারে, যাঁরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে বস্তু সম্পর্কিত সন্দিহানতা কতটুকু ছায়া ফেলতে সক্ষম হবে জানি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সত্য হিশেবেই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। শাদা চোখেও বস্তু সম্পর্কিত ধারণা যা, তাতে বিশ্বের সামগ্রিক ভিত্তিই বস্তু-ধারণার ওপরে নির্ভরশীল। যাঁরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান, তাঁদের কাছে কবিতা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়বে, তা সত্য। কিন্তু তাকে জীবন-স্পন্দিত কোনো কবি তো নয়ই, সচেতন পাঠক মানসও গ্রহণে সক্ষম হবে না।

'আমি কি, আমি কে?' এ উচ্চারণ আজকের নয়। জন্মলগ্নের সেই আদিম প্রকৃতি থেকেই এ স্বতোৎসারিত বাণীবৈভবে নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কি মানুষ নিজের জীবনচর্চার মধ্যে

খুঁজে পায়নি? যাঁরা পায়নি তাঁরা জীবনকে জীবনের মতো করে দেখতে অনাগ্রহী। আর তাই উর্ধমুখী রহস্যলোকে কতিপয় আত্মমগ্ন কবিমানসের অনিশ্চিত যাত্রা।

কবিতা বাস্তবের প্রতিকৃতি, কিন্তু অনিবার্যভাবে শৈল্পিক। শিল্পের মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে কবিতায় আবরণ বা অলঙ্করণে (যা কাব্যিক অর্থে নয়) বিশ্বাসী—যা কবিতাকে বাইরে ভয়ানকভাবে স্ফীত করে তোলে। কিন্তু গুণগত বিচারে যাকে কবিতা হিশেবে চিহ্নিত করা মুশকিল। যেহেতু কবিতার সাথে তার শিল্প-মানতার প্রশ্ন জড়িত, সেহেতু শিল্পের সাথে জীবন সম্পর্কের প্রশ্নটিও বড় হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যাঁরা জীবনকেই বাস্তবতা-বিচ্যুত বলে মনে করেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কবিতাকেও সে দর্পণে বিম্বিত করতে বাধ্য। কিন্তু যথার্থ কবি-হৃদয়ের সাথে কতিপয় বিরোধী হৃদয়ের সংঘর্ষ অনিবার্য এতেই।

আসলে পৃথিবীর কোন কবি বাস্তবতা-বিচ্যুত? বাস্তবতা ছাড়া শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। অবশ্য বাস্তবকে দেখার ভঙ্গীর মধ্যে ভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু প্রতিটি চেতনা থেকে প্রতিটি চেতনায় ব্যবধান জাগ্রত, সেহেতু বাস্তবকে দেখা ও রেখায় প্রতিফলিত করার মধ্যে ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও 'বাস্তবতা' এই 'কমন' প্লাটফর্মে সকলেই অভিন্ন।

অনেকে অবশ্য বাস্তব-সত্যের সাথে কবিতার সত্যকে আলাদা করে দেখতে চান। কিন্তু আমার মনে হয়, এর মধ্যে মূলত কোনো ব্যবধান নেই। রবীন্দ্রনাথ যতোই বলুন, 'যা রচিবে তুমি তাই সত্য/ঘটে যা তা সব সত্য নয়। কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'। আমরা তাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। কেননা যা ঘটে তাই সত্য এবং কবি তাকে প্রকাশ করেন এও সত্য। কবি যা সৃষ্টি করেন, তার সাথে বাস্তবের সাযুজ্য রয়েছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে কবি প্রধানত কবিতার সত্যকে বাস্তবের সত্য থেকে পৃথক করে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে কবি-চেতনার প্রকাশ তাঁর বাস্তব উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। অবশ্য, কবিতার সত্যকে শৈল্পিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করলে সেখানে অন্য রকম স্বীকৃতি গ্রাহ্য হতে

পারে। যেমন গ্রাহ্য হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পংক্তি কতিপয়। আসলে যাঁরা কবিতাকে আলোছায়ার মায়াবী প্রতিফলন বলে মনে করেন, তাঁরা কতিপয় মানসতার প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। বৃহত্তর মানসতা হয় উপেক্ষিত। ফলে এক জাতীয় ভ্রান্ত উল্লাস সমগ্র কবিচিত্তকে গ্রাস করে ; তাঁদের অন্তর-নিভৃতে কেবলি অন্ধকার, যে অন্ধকার জন্ম দেয় হতাশার। আর এ হতাশাই কবিচৈতন্যকে টেনে নিয়ে যায় অপরিচিতে, অজানায়। কাল্পনিক জগতে আশ্রয় লাভ করে হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাই কবিতা সম্পর্কে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয়। আর একটি কারণও এর নেপথ্যে কাজ করে। তা হলো, পরশ্রমজীবী মানসতা থেকে সত্যকে ক্রমাগত অন্ধকারে নিক্ষেপ করে মিথ্যেকেই সত্য বলে প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা। ফলে কবিতা হয়ে ওঠে আলৌকিক মনোলতা, যা স্বপ্নের বৃক্ষে ঝুলে থাকতেই অধিকতর আগ্রহী। এখানে যথার্থ অর্থে বাস্তবকে বাস্তব হিশেবে স্বীকার না করার প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। বস্তুর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন করে দেয়ার গবেষণা চলতে থাকে। যদি কৌশলগত প্রক্রিয়ায় বস্তুর ভিত্তিকে মিথ্যে বলে প্রমাণিত করা যায়, তবে তাবৎ বিশ্বের অস্তিত্বই সংশয়িত হয়ে ওঠে। ফলে কবিতার যে কোনো রকম ব্যাখ্যা চলে! প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র। সারা বিশ্বে যখন বৃহত্তর জনগণের ঐক্যবদ্ধ মানসতার প্রবল উচ্চারণ সুরেখ স্বাতন্ত্রে ভাস্বর হবার পথে, তখন এ ধরনের ষড়যন্ত্র পুঁজিবাদের স্বার্থেই!

শিল্প সংস্কৃতিতে পুঁজিবাদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ফলে তার আপাতপ্রতিক্রিয়া ব্যাপক না হলেও তার প্রভাবের সম্ভাবনাকে নাকচ করা চলে না। তবে আশার কথা, এ প্রবণতা সামাজিক নিয়মেই সর্বগ্রাসী হতে পারে না। কেননা মিথ্যে স্বপ্নের মধ্যে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন রাখা, সে অসম্ভব। বিশেষত, প্রতিনিয়ত জীবন যেখানে সংগ্রামী ও সংক্ষুব্ধ, ভবিষ্যতের পথে অগ্রগামী, সেখানে এ প্রভাব দীর্ঘপ্রসারী হতে পারে না। বাস্তবকে অস্বীকার করা যেহেতু নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা, বিমূর্ত ব্যাখ্যায় যাকে ঢেকে রাখা অসম্ভব ; সেহেতু জীবন-সত্য অনিবার্যভাবেই তার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

অবশ্য কেউ কেউ বাস্তবকে অস্বীকার না করে এবং স্বপ্নকে খণ্ডিত উপলব্ধিতে টেনে ধরে তার মাঝামাঝি অবস্থান বা অনুভবকে পরাবাস্তবতা বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। এ সত্যকে স্বীকার করে নিলে তাতে করেও বাস্তবের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে না। এমনকি স্বপ্নের মধ্যে যে ঘটনা, দৃশ্য বা কাহিনী ফুটে ওঠে, তাও বিকল্প-বাস্তব মাত্র। যদি তাই না হবে, তাহলে স্বপ্নের সত্য আমাদের উপলব্ধির আওতায় ধরা পড়ে কেমন করে? এ কারণেই কবিতায় পরাবাস্তবতার প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতারই স্বেচ্ছাবিভক্ত প্রকাশ মাত্র। কবিতাই হোক অথবা শিল্পই হোক, অলৌকিকতার কাছে আত্মসমর্পণ কোনোক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা, তা আসলে প্রয়োগ-বিভিন্নতা মাত্র।

সমাজ, কাল, পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করে কবিতা কেন, কোনো শিল্পই সৃষ্টি হয়নি, হতে পারে না। তবে, পূর্বেই বলেছি, এ সকল প্রকাশের ক্ষেত্রেও শতাব্দী-অত্যয়ী পাঠক মানসতার স্পর্শ পাবার আকাঙ্খা থাকলে স্রষ্টাকে ভাবতে হয়। বৃহত্তর মানস ভুবনের পরিচয় উদঘাটন করা যাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, যা দেশকাল অত্যয়ী শাশ্বত সৃষ্টিকর্ম—এ অবভাসে অবভাসিত হবার যোগ্য, তাঁকেই যথার্থ অর্থে বাস্তববাদী শিল্পী হিশেবে চিহ্নিত করা চলে এবং বিশ্বসংকটে এ শিল্পীর অবস্থান সর্বাগ্রে; এ কথা অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে যুগপৎ সমসত্যে ভাস্বর।

কবি-কবিতা-স্বাধীনতা

স্বাধীনতার আভিধানিক অর্থ 'স্ব-অধীনতা' হলেও তা স্থূল অর্থে অবশ্যই 'অধীনতা' নয়। কারণ ব্যক্তিক অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক অস্তিত্ব দ্বারা। ফলে কবির অধীনতা সামাজিক আওতা-সংযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অথচ অধীনতার অন্তরার্থে কবি অনিবার্যভাবে সমাজ-সংযুক্ত নন। আপাত-প্রতিক্রিয়ায় এ বক্তব্য 'স্ববিরোধী' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি যথার্থই কোনো আওতা নির্ধারিত নন। সেদিক থেকে কবি সামাজিক অস্তিত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েও যেমন তাতেই সীমাবদ্ধ নন, তেমনি তাকে এড়িয়ে গিয়ে ভিন্নমুখীও নন। বরং উভয়েই সেই অমোঘ বিন্দুতে মোহনা-মিলিত, যার প্রতিক্রিয়ায় মহত্তম সৃষ্টির প্রতিফলন অবশ্য সম্ভব।

স্বীকার্য যে, কবি অন্তর্দ্রষ্টা। যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর সমগ্র উপাদানের দিকে কবিকে প্রসারিত করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই কবির নিজস্ব। আর এ নিজস্বতা থেকে কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের অন্তর-উপলব্ধি একটি সামগ্রিক জীবন-বোধের নাভিমূল থেকে উৎসারিত হতে বাধ্য। অন্যথায় কবির কবিতার গতিপ্রবাহ পঙ্কিলতা মুক্ত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থ যদি শুধুমাত্র অধীনতা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কবির সৃষ্টিকর্ম ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলা যেতে পারে, যে কোনো পথানুসরণই কবির মানস নির্ভর। সে ক্ষেত্রে কবি-ব্যক্তির অন্তর-প্রতিক্রিয়া তাঁর নিয়ন্তা। কিন্তু এ বক্তব্যের দুর্বলতা এখানেই যে, স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা সমার্থক নয়। কবির নিজস্ব অনুভূতি আর স্বাধীনতা অনুযায়ী যে কোনো উপাদান গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তার অন্তর্গত অনুভবে কল্যাণ-চেতনা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে শৈল্পিক বিলাস যেমন বড় কথা নয়, তেমনি শিল্প-সুষমা-অস্বীকৃত স্বেচ্ছাচারও নির্বাসিত। যে কোনো কবির মন, মনন, বোধ কিংবা

প্রজ্ঞার অন্তরালে প্রবাহিত সেই নির্মল স্রোতধারা, যা সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত। এ সত্যকে যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁদের সৃষ্টির নেপথ্যে এক জাতীয় অপরাধ-প্রবণতা ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। যথার্থই কবি যদি সমাজের সেই সূক্ষ্ম কারিগর হয়ে থাকেন, তবে তাঁর দেখা ও লেখার মধ্যে সেই সরল রেখার রশ্মিপাত সন্দেহমুক্ত ও উজ্জ্বল হতে বাধ্য। কিন্তু এ জাতীয় অন্তরতাকে অনেকে মনে করেন সংকীর্ণতা। এবং এর উত্থাপন সেই গূঢ় রহস্যাবৃত গুহা থেকে, যেখানে কবিতাকে মনে করা হয় সমাজ-বিচ্ছিন্ন অলৌকিক অনুভূতির প্রতিফলন। তাঁদের ধারণা, কবিতার গূঢ় মর্মার্থ নির্ভরশীল সেই অমোঘ প্রেরণার ওপরে, যার সাথে সামাজিক উপ-যোগিতার কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তাঁদের উদাহরণ : প্রাচীন গুহা-বাসী মানুষ যখন পর্বতগাত্রে ছবি আঁকতো, তখন তারা শুধুমাত্র শৈল্পিক অনুপ্রেরণায় তা করেছে, সেখানে তাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির নির্দ্বিধ প্রতিফলন ঘটেছে ; এর অন্তরালে সামাজিক উপযোগিতার কোনো প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রসঙ্গটি সর্বতোভাবে অস্বীকৃত না হলেও বিস্তৃত অংশই অযৌ-ক্তিক। কারণ মানুষের জন্মের সেই আদি দিগন্ত থেকেই উপযোগিতা ছিলো, প্রয়োজন বলেই। মানুষের চাহিদা অনন্ত। একটি থেকে আর একটির দিকে পদপাত তার অপূর্ণতাজনিত অস্থিরতার কারণে। মানুষ চায়, অথচ সবকিছুই সে পায় না। তার চাওয়া অথবা পাওয়ার পেছনে রয়েছে সেই উপযোগিতার প্রেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মসূত্রই উপযোগিতা-জাত। অতএব গুহাগাত্রে অংকিত চিত্র নিসন্দেহে শিল্পীর সমাজ-সংযুক্ত ভাবনার বা প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত।

তবে আধুনিক যুগে সামাজিক উপযোগিতার সাথে জড়িত আধুনিক অর্থ-নীতি। আর এ কারণেই শিল্পীর মানসভুবনের বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক মানদণ্ড-নির্ভর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক জটিলতা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সামাজিক উপযোগিতার আতীতিক বিশ্লেষণের সাথে খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান বিশ্লেষণের একটা মৌল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সামাজিক উপযোগিতা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রেক্ষিত-ভিন্নতা সত্ত্বেও স্বীকৃত হয়েছে। অতএব এ সত্য অনিবার্যভাবে

গ্রাহ্য যে, কবির স্বাতন্ত্র্য সমাজ-বিচ্ছিন্ন বা সামাজিক উপযোগিতা-বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু প্রায়শই এ বিষয়ে উভয় মোহনা থেকে একটা অন্ধ ধারণা কবিকৃতির যথার্থ মূল্যায়নে বাধা দান করে। কোন অর্থে কবির স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং কোন অর্থে স্বাধীনতার মৌল পটভূমি প্রায় সামগ্রিক হৃদয়কে আলোড়িত করতে সমর্থ, সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশে তৎপর না হয়ে স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সমালোচনা একটি ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নিসন্দেহে স্বাধীনতা দু'টো অর্থ বহন করে। একটা বহির্গত, অন্যটা অন্তর্গত। যেটা বহির্গত, সেটা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর যেটা অন্তর্গত, সেটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি নিয়ন্ত্রণ করে দ্বিতীয়টিকে এবং উভয়ের সমাহারে অন্তর্গত স্বাধীনতার যথার্থতা নির্ণিত হয়। কবি এই দুটো প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তবে ব্যাপক-তম অর্থে কবি দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রভাবিত। কারণ রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় প্রত্যক্ষভাবে কবি জড়িয়ে পড়েন না সহসা। ফলে সাধারণ নাগরিক যে স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন, কবিও ততটুকু স্বাধীনতা ভোগেই সক্ষম হন। কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত রীতি গ্রাহ্য নয় বলেই কবিকর্মের প্রকাশ প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রায়শই তা ঘটে না। যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই কবি সরকার এবং সরকারে অধিষ্ঠিত দলের বিশেষ আদর্শের কারণে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হন না। সে কারণেই দেখা যায় সোভিয়েত সাহিত্যে বর্তমান বন্ধ্যাত্ব। অথচ বিপ্লব-পূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্যে যে উৎকর্ষ দেখা গিয়েছে, এখন সেখানে তা অকল্পনীয়। তার কারণ, সেখানকার সাহিত্যে একটি সুনির্দিষ্ট ছক বেঁধে দেয়া হয়েছে। ফলে একটি বিশেষ সীমানার বাইরে পদচারণা করা লেখকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কবিতার ক্ষেত্রেও সেখানে এ ধরনের বন্ধ্যাত্ব চলেছে। সেখানে যথার্থ অর্থে কাব্যিক উৎকর্ষে ভাস্বর কবিতা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। সবার কবিতাই যেন একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-মাফিকতায় এঁটে দেয়া হয়েছে; যদিও এর বিষয়বস্তু কল্যাণ-চেতনা-সম্পৃক্ত। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তুই শুধু শৈল্পিক-সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে না। তেমনি মানবতা বিরোধী কবিতা

যতোই শৈল্পিক কারুকাজে সমৃদ্ধ হোক না কেন, তা মানব সমাজের জন্যে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সেই কবিতা প্রয়োজন, যা সামগ্রিকতাকে ধারণ করে যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তা হচ্ছে না। চীনের সাহিত্যক্ষেত্রেও একই বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তেমনি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও পরোক্ষ বিধি-নিষেধ আরোপিত হবার ফলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়মতান্ত্রিকতার ক্ষতিকর দিক। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও স্বেচ্ছাকৃত বিধি নিষেধের ফলে আজ সেখানকার কবিতাও হয়ে উঠেছে বিবৃতি, শ্লোগান, না হয় প্রোপাগাণ্ডা। শৈল্পিক রীতি ভুলে গিয়ে কবিতাকে শুধুই শ্লোগান করে তোলা হচ্ছে। এটা নিসন্দেহে কবির স্বাধীনতার ওপর বহির্গত এবং অন্তর্গত আঘাত। একই সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শোষক ও শোষিতের মধ্যে ব্যবধান বজায় রেখে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি বড় হয়ে দাঁড়ায় বলে সেখানেও মুক্তচিন্তার প্রতিফলনে কবিতার বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব হয় না। ফলে প্রায়শই দেখা যায়, এ সব দেশের কবিরা শৈল্পিক রীতিতে সমৃদ্ধ হয়েও বক্তব্যগত বা অনুভূতিগত বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। অতএব এখানেও কবি স্বাধীন নন।

আসলে বিষয়ে বা ভাবে কবির স্বাধীনতা থাকে না। যে টুকু থাকে, তা শুধু প্রকাশভঙ্গীতেই। শিল্পের উদ্বৃত্ত প্রেরণা অথবা যে কোনো অনুষঙ্গের কথাই বলা হোক না কেন, কবি প্রচলিত অর্থে কখনো স্বাধীন নন, যেমন স্বাধীন নন সাধারণ মানুষও। পাকিস্তানের মতো একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্রেও কবিদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হতো না। 'ইসলামী সাহিত্য' সৃষ্টির নামে স্রষ্টা-দের এক্সপ্লয়েট করাই ছিলো পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে তাঁরা সফলও হয়েছিলেন অনেকটা। অনেকটা বললাম এ কারণে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁরা হরণ করতে পারেননি। যদি তা পারতেন, তা হলে 'বিরুদ্ধ সাহিত্য' অবশ্যই সৃষ্টি হতে পারতো না। প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিরোধী স্রষ্টা সব দেশে সবকালেই কিছু না কিছু জন্ম নিয়েছেন। আর এ কারণেই মহৎ স্রষ্টাও আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে এ কৌশলটির ব্যবহার নিপুণ হতে পেরেছে এ কারণেই যে, একটি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে

ধরে রাখার ক্ষমতা কবিতার যতোখানি রয়েছে, অন্যান্য প্রকাশ মাধ্যম-গুলোতে ততটা নেই। ফলে কৌশলে স্বাধীন বক্তব্য বলার মতো দুসাহসী কবিরাই যথার্থ অর্থে স্বাধীন। আর স্বাধীনতা শব্দটি প্রচলিত ধারণার বাইরেই প্রকৃত অর্থ-সমন্বিত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন এ সত্যের যথার্থ প্রমাণ হিশেবে উপস্থাপিত হতে পারে। তৎকালীন সমস্ত কবিতা একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বৃত্তে বৃত্তায়িত বলে কবিরা দেব-দেবী ছাড়া অন্য কোনো প্রেক্ষিতকে কবিতার অন্তরে ধারণ করতে পারেননি। যা পেরেছেন তা হলো রাজা-বাদশার গুণকীর্তন। যে রাজ্য অথবা যে বাদশার অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে কবি কবিতা রচনা করেছেন, তার প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রভুকীর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে কোনো কাহিনীকেই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা স্বাধীন হতে পারেনি কখনো। সেখানে কবির স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি-হৃদয়ের নিভৃত স্বাধীনতাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। আর সে কারণেই দেব-দেবী মাহাত্ম্য বা রাজা-বাদশার গুণকীর্তনের কাহি-নীর অন্তরাল থেকেই বেরিয়ে এসেছে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার অবিকৃত চিত্র। জেগে উঠেছে অর্থনৈতিক দুরবস্থার অকৃত্রিম প্রতিবেদন। এখানেই কবির মৌলিক স্বাধীনতা নিহিত।

প্রচলিত নিয়ম স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম উদঘাটনে সক্ষম নয়। বরং স্বাধীন-তার প্রকৃত চেহারা আবিষ্কার করতে হলে অন্তর্গত মানস সরোবরে আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। আমরা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধকেই স্বাধীনতা বিরোধী একমাত্র প্রক্রিয়া বলে মনে করি। আসলে এই ধারণা পুরোপুরিভাবে সঠিক নয়। তার অর্থ এও নয় যে, এই বিধি-নিষেধ কোনো বাধারই সৃষ্টি করে না। করে অবশ্যই ; কিন্তু তাকে যতো বেশী শক্তিশালী মনে করা হয়, আসলে তা ততো বেশী শক্তিশালী নয়। যদি তাই হতো, তাহলে যুগে যুগে প্রতিকূল প্রতিবেশ-অত্যয়ী মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হতো না। পৃথিবীর ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যাবে, আপাত স্বাধীনতা-হীনতার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন, যদি সমাজ মানুষের চেতনার নিয়ন্ত্রক হয়ে থাকে,

তাহলে সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডি ভেঙে স্বাধীন সাহিত্য সৃষ্টি কী করে সম্ভব? এ চিন্তায় একটি মৌল ত্রুটি কাজ করে, তা হলো সমাজকে একটি গতিহীন নিয়মতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ করে ফেলা হয়। কিন্তু সমাজ কোনো জড় বস্তু নয়। এর মধ্যে রয়েছে গতিপ্রবাহ, বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমাজ-ব্যবস্থা বিবর্তিত হচ্ছে। একটি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই অগ্রগামী সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের বীজটি সুপ্ত রয়েছে। যাঁরা কবি, তাঁরা সমাজের সূক্ষ্মতম কারিগর বলেই অন্তর্বৃত বীজটিকে চিনতে পারেন। সমাজের মধ্য থেকেই তিনি অনুপ্রাণিত হন সেই অতিক্রমী লক্ষ্যে পৌঁছতে। সমাজের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তর থাকে, সেহেতু সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও সকলেই একটি বিশেষ দিকে অগ্রগামী হন না। আর সামাজিক স্তর-বিভিন্নতায় চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কবির স্বাধীন চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে।

অতএব এ সত্য স্বীকার করতেই হবে, কবি সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এবং তাঁর প্রচলিত স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা বিমুক্ত নন। কারণ কবি সমাজের মানুষ হিশেবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা অথবা সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও তাঁর অন্তর্গত মানস প্রতিফলন, যা তাঁর কবিতা হিশেবে চিহ্নিত, তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ মানে না। অতএব তা অনিবার্য-ভাবেই স্বাধীনতা-জাত। দেখা যাবে, মহৎ সাহিত্য স্বাধীন-চেতনার প্রতিফলন ছাড়া কখনো সম্ভব হয়নি। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তার কল্যাণ-চেতনা এবং প্রকাশ-নৈপুণ্য কবিতাকে অনন্য প্রতিভাসে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা শব্দটি আপেক্ষিক। তাই এর যথার্থ প্রতিবেদন নির্ণয়ে প্রায়শ বিভ্রান্তি দুর্লক্ষ্য হয় না। যদি যথার্থই কবি ও কবিতার স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করতে হয়, তাহলে কবি-হৃদয়ের অন্তর্বৃত কোরকের ঘ্রাণ নেয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় ব্যর্থতা অনিবার্য।

আত্মপ্রকাশের অসম্পূর্ণতা ও কবির অতৃপ্তি

আমার তো মনে হয় প্রতিনিয়ত দৃশ্যাবলোকন, যা প্রকৃতপক্ষে মনো-প্রতিক্রিয়া, তাকে শব্দগুচ্ছে ধরে রাখা অসম্ভব। আপনি যা ভাবছেন, আমি যা ভাবছি কিংবা আর কেউ যা ভাবছেন, তার সব কিছুই কি ধরে রাখা সম্ভব? শব্দের বা অক্ষরের আওতায়, ব্যাপকতা ব্যাখ্যা না করে আপাত উচ্চারণে বলা যায়, ভাষার আওতায় এই সকল অনুভবের প্রকাশ সম্ভব? এ ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক চিহ্নের অবকাশ থাকে। কেননা মানুষের কল্পনার ভেতরে যে অদৃশ্য তার সূক্ষ্ম ঝংকারে তরঙ্গিত, তা কখনো ভাষার কতিপয় সীমিত সম্ভারে পুরোপুরিভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো তাহলে একটি 'ভাষা' আর একটি 'মন' এমত চিহ্নন অপ্রয়োজনীয় হতো। মূলত এদের মধ্যে ব্যবধান: একটি, কতিপয় সংক্ষিপ্ত অক্ষর, প্রতীক বা শব্দমালার সমষ্টি, যা গ্রন্থনা শেষে অবশ্যই অর্থবোধক। অন্যটি, আভ্যন্তরীণ অথচ গহনতাস্পর্শী—যা কখনো সীমাবদ্ধ নয়, বলা যেতে পারে অসীম এবং বিশ্বের তাবৎ দৃশ্যপট যেখানে অতি সহজেই ধরে রাখা সম্ভব। আসলে মনো-ঝংকারের ক্ষেত্রটি যেন সমুদ্র কিংবা তারো চেয়ে আরো বড় কিছু, যাকে উপমায় চিহ্নিত করা কঠিন। আর তার প্রবাহ যেন নদী, যদিও পরিণতি সমুদ্র সঙ্গম; যাকে বলা যেতে পারে মোহনামিলন। এবং এ মিলন স্থূলতাস্পর্শী নয়, বরং তলদেশের গভীরতর অর্থদ্যোতনায় সমৃদ্ধ। তবুও এই আপাত অবলোকনই অধিকাংশ মানসে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এবং যা যথার্থই সীমাবদ্ধ।

সতের বছর বয়সের সেই কবি র‍্যাবো উদ্বৃত্ত ভাব প্রকাশের অসম্পূর্ণতায়, একদিন 'ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়' বলে কবিতার জগত থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই একই কারণ-প্রসূত কি কাফ্‌কার

একচল্লিশ বছরের জীবনে আশ্চর্য নিশ্চ্‌পতা এবং উইলে মৃত্যুর পরে তাঁর সৃষ্টিকর্ম পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ? কিংবা রাবীন্দ্রিক ভুবনে প্রথম স্পর্শের নায়ক বিহারীলালের 'ভাব আছে, ভাষা-নেই'-এর ব্যর্থতা? আসলে সবই সেই রুদ্ধ দরজার আভ্যন্তরীণ বাতাস অ-চলার ফলশ্রুতি। যেখানে অতৃপ্তির অনুভব চরমতম বিপর্যয়ের স্রষ্টা। বিশেষত কাব্য-সৈকতে এ চোরাবালির প্রবলতা সহজ-গোচর।

অবশ্য কবি হৃদয়ে এ অতৃপ্তি নতুন নয়। বরং এ অতৃপ্তিই জন্ম দেয় সার্থক শব্দসম্ভার, যা সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট এবং যা ক্রমাগত তাড়িয়ে বেড়ায় সেই অনির্দেশ্য জগতে। যদিও এই অনির্দেশ্য জগত কোনো কোনো হৃদয়ে অলৌকিক, তবুও ব্যাপকতম মানসতায় এ স্বতস্ফ্‌র্ততা কখনো বস্তুজগত বিচ্ছিন্ন উপকথার বা রূপকথার দেশ নয়। যদিও এ পর্যন্ত চেতনালোকের ভিন্নতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে স্বপ্নলোক হিশেবে অবাক ব্যাখা দানের চেষ্টা হয়েছে, তথাপি এ মত সুরভিত এখনো: এ জাতীয় খণ্ডিত মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। এ সত্য সমর্থিত, বাস্তবের রূঢ় প্রতিকৃতিই কবিতা বা শিল্প নয়। কিন্তু তা কোনোক্রমেই স্বপ্ন সদৃশও নয়। শিল্পের নতুন বিশ্লেষণে ভাবজগতের বা কল্পনাজগতের চিহ্নন হয়েছে স্যুররিয়া-লিজম বা পরাবাস্তব গ্রন্থিহীনতায়, যার কোনো বস্তুতান্ত্রিক রূপ নেই। পরাবাস্তবতা ভাবও নয় বস্তুও নয়—তার মাঝামাঝি একটি দরোজা, যা সমস্ত শিল্প-কর্মের জনক। যেহেতু বস্তুর স্পর্শগুণ, দৃশ্যগুণ অথবা গ্রহণগুণ রয়েছে, সেহেতু তার অস্তিত্ব সম্পর্কিত সন্দেহ যথার্থ নয়। ভাবজগত সম্পর্কিত পরাবাস্তব প্রতিবেদন অস্বীকারে ঋজু ভিত্তি উপস্থাপন অবশ্য অসম্ভব। বিশেষত বিশ্ব-বিস্তারে পরাবাস্তবতা ব্যাপক পরিধি থেকে ক্ষুদ্র পরিধি পর্যন্ত বিতর্কিত। ফলে এখন পর্যন্ত তা সবার কাছে স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্য নয়। তবুও এই শব্দযোজনা মিথ্যে, এমন সুনির্দিষ্ট অবজ্ঞা প্রকা-শও সঠিক নয়। যেহেতু পরাবাস্তবতা শুধুমাত্র একটি শব্দ উচ্চারণই নয়, তার একটি অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তার যথা-র্থতা সম্পর্কে বিতর্ক সম্ভব হলেও তাকে অস্বীকার করা চলে না। আমা-দের গ্রহণে দ্বিধা, কেননা কোনো মধ্যবর্তী অলৌকিক অবস্থানে আমরা

বিশ্বাসী নই। হয় এপার না হয় ওপার। মধ্যবর্তী নদীর মতো চেতনা-নিভৃতে তেমন কোনো অবস্থান অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্বপ্নের জগতে দৃষ্ট ঘটনাসমূহই সত্য অথবা প্রতিনিয়ত যা ঘটছে বলে আমরা দেখছি বা বিশ্বাস করছি তা-ই সত্য; পরাবাস্তবতার বিতর্ক এ প্রশ্নের অন্তর ছুঁয়ে যায়। আমাদের বিশ্বাস বস্তুর অস্তিত্বে। পরাবাস্তববাদীদের বিশ্বাস বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহানতায়। আপনি, আমি আপাতদৃষ্টিতে যা দেখছি স্পর্শ করছি তা প্রকৃতই স্পর্শ করছি কিনা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরা-বাস্তবতা সমস্ত কিছুরই এমত বিশ্লেষণ করে থাকে। ফলে এ ক্ষেত্রে নৈরাশ্য শিল্প সৃষ্টিতে বাধা দান করে। বোঝা যায়, এ ক্ষেত্রেও অতৃপ্তি। কিন্তু পরাবাস্তববাদীদের অতৃপ্তি কবিচেতনার উদ্বৃত্তির অসম্পূর্ণতাজাত নয়। বরং কবিচেতনার অনুদ্বৃত্তির অসম্পূর্ণতাজাত। আর এখানেই ব্যবধান উদ্বৃত্ত কবিপ্রাণনার সাথে অনুদ্বৃত্ত কবিপ্রাণনার। কিন্তু এদের সাদৃশ্যও রয়েছে একটি ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্র অতৃপ্তির। এবং তা থেকেই বিতৃষ্ণার জন্ম। কবিতার প্রতি, জগতের প্রতি, মানুষের প্রতি, সর্বত্র সমস্ত কিছুর প্রতি। যুক্তি: আমি যা করতে চাই, আমি যা বলতে চাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ তা প্রকাশ অসম্ভব। আর এই অসম্ভব শব্দ সন্ত্রাসই সৃষ্টিকে খণ্ডিত করে। ফলে খণ্ডিত প্রসবের চেয়ে নির্বাসনই শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আমরা এই অনুভবের বিপরীত পিঠে। আমরাও বিশ্বাস করি অক্ষরের বা ভাষার নির্দিষ্ট ওজন রয়েছে, যার বেশী তার পক্ষে কখনো বহন করা সম্ভব নয়। তুলনায় অনুভব এত দীর্ঘ, স্ফীত এবং প্রসর, যাকে পরিমাপিত সম্ভারে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তা-ই বলে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সমাধান যথার্থ হতে পারে না। নগদ পাওনার মতো প্রেরণার একখণ্ড হীরকদ্যুতিও মহামূল্যবান। শুধুমাত্র আত্মতৃপ্তির জন্যে রচনা হলে সে ক্ষেত্রে ভিন্নরকম বিশ্লেষণ সঠিক হতে পারতো। কিন্তু কবিহৃদয়ের প্রকাশ যেহেতু ব্যাপকতম মানস-স্বীকৃতির জন্যে নিবেদিত, সেহেতু আপাত দৃষ্টিতে এ কৈফিয়ত সত্য হলেও মূলত গ্রহণীয় নয়। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার গোপন গোয়েন্দাগিরি এই প্রয়াসের ভেতরই আবৃত। এবং যে

কোনো কারণই এর নেপথ্য সক্রিয় থাক না কেন, মূল সমস্যা চৈতন্য-গ্রন্থিতে। যুগ বিবর্তনের ধারায় জটিলতা মানস-মুকুলকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে যে, সেখান থেকে যে কোনো অভিব্যক্তির আপাত পরিচয় আবিষ্কার অসম্ভব। এ জাতীয় কৈফিয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টা হলেও তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক নয়। কেননা যে জটিলতা হৃদয়ে অবভাসিত, তার মধ্যেও রূপভেদ স্পষ্ট। ফলে একটি বিশিষ্ট বা কৌণিক সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি ভাবছি, আপনিও ভাবছেন সত্য; কিন্তু আমি যেভাবে ভাবছি তা আপনি যেভাবে ভাবছেন, কোনোমতেই সে রকম নয়। এটি ঘটে দেশ, কাল, পরিপার্শ্ব-ভিন্নতার কারণে এবং এ কারণেই দুর্বোধ্যতার প্রকাশ এবং তার অন্তবৃত স্বরূপও বিসদৃশ হতে বাধ্য। যদিও চেতনায় আন্তর্জাতিক ধারণার সংযোজনে নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে মোহনা-মিলনের কৈফিয়ত সোচ্চার, কিন্তু তার বহিরঙ্গের জৌলুষ যতো ঝলকিত, অন্তর্বৃত পরিচয়-উদঘাটি সৌন্দর্য ততটুকু হৃদয়স্পর্শী বা আন্তরিক নয়। আর এ কারণেই জটিলতার সমধর্মী কৈফিয়তে কবিতায় দুর্বোধ্যতার অঙ্কন যথার্থ বলে মেনে নিতে স্বাভাবিক কারণেই দ্বিধা জাগে। কবিতায় দুর্বোধ্যতা অঙ্কনের সপক্ষে একদেশীয় চেতনা অন্যদেশীয় কবিচেতনা বা কবিকর্মের সাথে এক করে দেখানো যুক্তিসঙ্গত নয়।

যাঁরা যথার্থই মহৎ কবিকর্মের উজ্জ্বলতায়, তাঁদের চেতনা বিতত উপলব্ধির গভীরতর সমুদ্রে। কারণ হৃদয়ের সুন্দরতম অভিব্যক্তি তাঁদের কবিতায় সহজ পথ-পরিক্রমী। অকারণ শব্দ-সম্ভারে মৌল অনুভব সেখানে ভারাক্রান্ত নয়। যে অতৃপ্তিবোধ কতিপয় কবির দুর্বোধ্যতার হাতিয়ার, সেই অতৃপ্তিবোধই মহৎ কবির মহত্তম সৃষ্টির প্রেরণা। যদিও আমরা শব্দসম্ভারের ঘনত্বে পলায়ন যেমন আশা করি না, তেমনি মহৎ কিছুর প্রকাশের অসম্পূর্ণতায় কাব্যজগত থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসনও আমাদের কাম্য নয়। আমাদের প্রাণিত প্রার্থনা, উজ্জ্বলতম হীরকদ্যুতির যেটুকু স্পর্শই আমরা লাভ করি, তা-ই আসলে কবিতা এবং তাতেই আমাদের লাভ। নির্বাসন অথবা নির্গমন উভয়ই কাপুরুষতা। চেতনা জাগার পর থেকেই মানুষ তার অনুভবের প্রকাশ-ক্ষেত্র অনুসন্ধান করেছে। তাই পর্বতগাত্রে অঙ্কিত হয়েছে

চিত্র, তৈরী হয়েছে ভাস্কর্য। প্রকাশ মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। তাই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মানুষ থেমে থাকেনি। আর থেমে থাকেনি বলেই সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যদিও অগ্রগতির পরিমাপ সম্পর্কে বিতর্ক হতে পারে। তবুও এ সত্য স্বীকৃত: আমরা এগিয়েছি। এবং এ অগ্রগামিতার সাথে সাথে মানুষের আত্মপোলব্ধির প্রকাশের ভাষাও বিচিত্র-মুখী হয়েছে। নতুন উদ্ভাবন চেতনার নিভৃত কপাট খুলে নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছে। এবং এটাই নিয়ম। অবশ্য স্বীকার্য, নিয়মের স্থায়িত্ব বদ্ধ জলাশয়ের মতো নয়। কিন্তু সামাজিক বিবর্তন যেহেতু উৎসাভিমুখী নয়, বরং সমুখগামিতায় নিয়ম নির্দিষ্ট; সেহেতু উপলব্ধির, আকাঙ্খার অগ্রগামিতা অনিবার্য সত্য হতে বাধ্য। এটি বিজ্ঞানের যৌক্তিক ভিত্তি। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এগুচ্ছে। পথে পথে বাধা, সংগ্রাম, সংঘর্ষ। অত:পর উত্তরণ। বিবর্তনের পদ্ধতিই এটা। এখন পর্যন্ত এ মত অখণ্ডিত। ফলে মানুষের অত্যয়ী অভিলাষজাত সঁঞ্চালন অস্বীকৃত নয়। আর তাই থেমে থাকা সাহসিকতা নয়, কাপুরুষতা। যে মানুষ কথা বলতে জানে না, তার হৃদয়-নিভৃতেও শব্দ উচ্চারণের আকাঙ্খা ঝিলকিয়ে ওঠে। সেখানেও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আর ভাষা তো কতিপয় অক্ষর বা প্রতীকের বিন্যাস। সেখানে সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতা মেনে নিয়েও যাঁরা এর মধ্যে পুরে দিতে পারেন গহন সমুদ্র, কৌশলে রেখে দিতে পারেন নিশব্দ গর্জন, তাঁরাই স্রষ্টা হিশেবে মহত্বের দাবীদার।

আসলে আত্ম-উন্মোচনই বড় কথা। সবাই তা পারে না। কৃত্রিমতা সত্যকে গ্রাস করে। এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ধকার। যাঁরা আলোর জনক, সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। কেউ কেউ আত্ম-উন্মোচনে আত্ম-প্রতারণা যেমন করেন, তেমনি পাঠক-মানসকেও অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত করেন। সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি চরমতা পায়। মুক্ত চেতনা তার উপলব্ধির সম্পূর্ণ প্রকাশে অসমর্থ হলেও, তাতেও যে ব্যাপকতম তরঙ্গ জাগে, কবি-হৃদয়ের উজ্জ্বলতা অনুভবে তা-ই আসলে নিহিত ইঙ্গিত। পূর্ণ-প্রকাশের অসম্পূর্ণতা জেনেও কবি-হৃদয় সমুখ সমরে সংঘর্ষ করেছে। অত:পর বাধা কেটে কেটে এগিয়ে এসেছে। যে কবি, র‍্যাবো সতের বছর বয়সে

তাঁর শ্রেষ্ঠতম কবিতায় আমাদেরকে বিস্মিত করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কেও এরপর সহজেই হৃদয়হীনতার অভিযোগ তোলা যায়। তবে কি তাঁর কবিতা ভাব-বিমুক্ত? তা-ও নয়। আসলে র‍্যাবোর উক্ত বাণীবিন্যাস যে তাঁর আত্মোপলব্ধিরই প্রকাশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ আমাদের চেতনায় এ ধারণা শৈশব থেকে বর্তমান সময় অব্দি সঞ্জীবিত: ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন। আসলে এই শব্দসমষ্টি অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু যে কারণে র‍্যাবো এই অতৃপ্ত উচ্চারণ করেছেন, তা গভীরতর তলদেশস্পর্শী। যেমন, প্রথম প্রথাসিদ্ধ নিয়ম বিন্দু এবং বিন্দুতে সিন্ধুকে ধারণ দ্বিতীয় প্রথাসিদ্ধ নিয়ম। র‍্যাবো-উচ্চারিত শব্দসমষ্টি এই দ্বিতীয় নিয়মকে ধারণ করে আছে। এই ব্যবধান সূক্ষ্মতম। ফলে অন্তর-উপলব্ধি ব্যতীত তার হৃদয়স্পর্শ অসম্ভব।

কবিতায় স্বপ্নচারণা

সন্দেহ নেই স্বপ্নচারণার অন্তর্গত আনন্দ শুধু কবি হৃদয়কে আলোড়িত করে না, প্রতিটি চৈতন্যালোকে তার একটি রোমাঞ্চিত শিহরণ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে এর মূল্যায়ন কোন ভিত্তিতে স্থিত হবে, তা একটি স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক প্রশ্ন হিশেবে উপস্থাপিত হতে পারে। কেননা স্বপ্নের অন্তর্বৃত আনন্দ সকল চৈতন্যকে যখন আলোড়িত করে, ব্যক্তি তখন স্থূলার্থে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কবি-চৈতন্যও যদি 'কবি' শিরোপা লাভের পর ব্যক্তিচৈতন্যের সাধারণত্বের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে অবভাসিত ঐ শব্দসত্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ এ স্বীকৃতি অনিবার্য এবং স্বতসিদ্ধ যে, কবি ব্যক্তি হয়েও ব্যক্তির চেয়ে আলাদা। ব্যক্তি-চিহ্নের এই ব্যবধানই কাব্য বিচারের মৌল কেন্দ্রভূমি স্পর্শ করতে সহায়তা করে। কিন্তু কবি-ব্যক্তিত্বের সাথে সাধারণ মানসতার ব্যবধান কতো দূর প্রসারিত সে ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু যাঁরা মতভিন্নতার সুযোগে এটা বলতে চান যে, এই ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে আকাশ পাতাল, তাঁদের সে মতামত আমার মনে হয়, সত্য সংকোচনের অপচেষ্টা মাত্র।

হতে পারে, কবি এই সমাজ, এই পরিপার্শ্বের মধ্যে থেকেও নিজস্ব একটি বৃত্ত তৈরী করেন। এবং সে বৃত্তের সমগ্র দিক থেকে নিপুণ কারিগরের মতো অলংকারের গোপন দরোজা খুলে দেন। অনুভবের তরঙ্গিত নিস্বরণ, যাকে বলা হয় কবিতা, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং তার জন্মসূত্রের চাবিকাঠি এই হৃদয়ভূমি স্পর্শ করে আছে। কিন্তু কবিতার এই প্রেক্ষিত বা কবি-হৃদয়ের এই নিভৃততম বৃত্তও কি বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন? তা অসম্ভব। অসম্ভব, কেননা কবি নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না কখনো;

যেমন পারে না বৃক্ষ তার মাটির মমতা থেকে দূরে সরে যেতে। এখনো যাঁরা কবিতাকে শুধুমাত্র স্বতস্ফূর্ত অনুভবের ফসল বলে মনে করেন, তাঁদের পক্ষেই কবির স্বতন্ত্র জগতের অলৌকিক ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব। যাঁরা যথার্থই জীবনকে জীবনের মতো উপলব্ধি করেন, তাঁদের চৈতন্য-গোলকে কবিতার অস্তিত্ব বাস্তব। যেহেতু কবি এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিটি অণু পরমাণুতে নিজের জীবনকে লালিত এবং স্ফীত করে তোলেন, সেহেতু তাঁর সৃষ্টিকর্মে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। আর অভিজ্ঞতা কখনো অলৌকিকত্বের ধারক হতে পারে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বলতে আমি এটা বোঝাতে চাইছি না যে, তা শুধুমাত্র বয়স অতিক্রমের মানদণ্ডে পরিমাপিত হবে। আজকে যাঁরা কবিতা রচনা করেন, তাঁরা বহু ইতিহাসের বাঁক পেরিয়ে এসেছেন। তাই স্বপ্নচারণা স্বাভাবিক অর্থে শিহরণ সৃষ্টির নিয়ামক হলেও বর্তমান প্রেক্ষিতে তা প্রত্যাখ্যাত। সমগ্র বিশ্বজুড়ে জীবন এবং সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের যে অনিবার্য তাগিদ দেখা দিয়েছে, তার কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক। যেহেতু প্রতিটি মানুষের চৈতন্য-প্রতিকৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে তার পরিপার্শ্ব, সমাজ এবং রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনের সাথে সাথে, সে কারণেই বর্তমান যুগে কবিতায় স্বপ্নচারণা প্রায় নির্বাসিত বলা চলে।

সুধীন দত্ত, যিনি কবিতায় স্বপ্নচারণার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাঁর সৃষ্টিকর্মের পূর্বাপর বিশ্লেষণে এ সত্যের বিশিষ্ট চিহ্নও দুর্লক্ষ্য মনে হবে না। রোমান্টিকতা মানেই স্বপ্নচারণা, এমন মগ্নচৈতন্যে যারা আত্মস্থ, তাদের পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব স্বপ্নচারণাই কবিতা। অবশ্য কাব্যের বিষয়-বস্তু কল্পনার গূঢ়সমাহারে সিক্ত হলেই যে তা স্বপ্নচারণা বা স্বতস্ফূর্ত প্রতিভাস হিশেবে চিহ্নিত হবে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে লক্ষণীয়, কবিতার সামগ্রিক অর্থদ্যোতনায় কবির শ্রমের বা অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর কতটুকু। স্বভাব কবিকে স্বাভাবিক বলে মনে করায় কবিতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেভাবে আছন্ন হয়েছিলো তা যথার্থ কবিদের মূল্যায়নেও আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, কবিতা মানেই অলৌকিকতা, যা স্বভাব-কবিত্বের স্বাক্ষর। 'আধুনিক যুগে' এই বোধ

পরিবর্তিত হয়েছে, বলা উচিত, পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা কবিই। এ কারণেই বোদলেয়ারকে 'অবক্ষয়ের কবি' হিশেবে আখ্যায়িত করা হলেও এবং তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সমগ্র চেহারা অবলোকন করে এ সত্যের অঙ্কন স্বাভাবিক বলে মনে হলেও সত্য, কবিতার এক ভিন্নতর রূপের দিকে যাত্রা শুরু সেখান থেকেই।

যদিও আমরা বোদলেয়ারের জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী নই, তবু তাঁর এই নতুন অভিসারী দিক-চিহ্নের ঐতিহাসিক মূল্যায়নকে স্বীকার করেই কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থদ্যোতনার পরিবর্তন চাই। কেননা আমার তো মনে হয়, কবিতা শুধু কিছু নরম শব্দের পল্লবিত উচ্চারণ হতে পারে না। তাই কবিতার স্বতসিদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে আধুনিক কবিতার বিদ্রোহ সময়-সঙ্গত। এই মৌল সত্যটা সর্বকালীন হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অসাম্য-জনিত পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে তার রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আসলে বিশ্বের সর্বকালীন মহৎ সৃষ্টিকর্মই বাস্তবতার উজ্জ্বল প্রতিভাস। সেখানেও অভিজ্ঞতার দর্পিত প্রতিফলন, যা কবি হৃদয়ের উপলব্ধির ব্যাপকতম রেখাচিত্র, যাকে শুধু কবিতা হিশেবে চিহ্নিত না করে ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির আশ্চর্য সম্মিলন বলা যেতে পারে। যেখানে বিশ্বের ব্যাপক প্রেক্ষাপট এসে যুক্ত হয়েছে কয়েকটি শব্দগুচ্ছের অমিত তেজের ভেতরে। এবং একজন কবির সার্থকতার গূঢ় রহস্য তাঁর এই পঠন-পাঠনের বিশাল ভুবনের আত্মপ্রকাশের উজ্জ্বলতার ওপরেই নির্ভরশীল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, আপনার, আমার কিংবা আমাদের মতো আর কারো উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও সেই একান্ত আপন জিনিষগুলোকে আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। অথচ কবি নির্বিবাদে অসংখ্য পংক্তি-মালায় তাঁর উপলব্ধিকে সাজিয়ে যাচ্ছেন। কবি-হৃদয়ের স্পর্শে এক একটি শব্দ ঝলকে উঠছে। এক একটি নক্ষত্রের মতো এক একটি কবিতা লুটিয়ে পড়ছে। আসলে এখানেই একজন কবির সাথে একজন সাধারণ মানুষের চৈতন্য-ব্যবধান। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে প্রকাশই বড় কথা। আমি যে ভাবেই উপলব্ধি করি না কেন, কিংবা আপনি যে কোনো ভাবেই

উপলব্ধি করুন না কেন, তার কোনো মূল্যায়ন সম্ভব নয়, যতোক্ষণ না তা প্রকাশ লাভ করছে। এ প্রকাশ লাভের মধ্যেও রূপভেদ আছে। যে কবির উপলব্ধির শিখা বিশ্ব-পটভূমিতে বিতত, তার প্রকাশ থেকে একজন স্বভাব কবির প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট হতে বাধ্য। কবিতার মূল্যায়নে স্বভাব-কবিত্বের প্রশ্রয় তাই এখন অনেকাংশে নির্বাসিত। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এখন ব্যাপকতম পরিধি-আশ্রিত কবিতা।

অনেকে মনে করেন, কবিত্ব ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আলৌকিক তা আসলে ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভার প্রতিফলন। এই বোধও স্বপ্নতাড়িত ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। যাঁরা এ ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক অর্থে উল্লেখ করে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে আলৌকিক ভীতির শিকার। তাই অপার্থিব বোধ থেকে অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে কবিতাকে তাঁরা সহজেই জড়িয়ে ফেলতে পারেন। এর ফলে তাঁদের বিভ্রান্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু কাব্যের বর্তমান ইতিহাসে তাঁদের বিভ্রান্ত ভাবনা যে অগ্রাহ্য, সে সত্য উল্লেখের প্রয়োজনই পড়ে না। কেননা কবিচেতনাও সমাজের সাথে যুক্ত। এ কারণেই সামাজিক পটভূমির আলোড়নে স্বপ্নতাড়িত আলৌকিক ভাবনা নির্বাসিত। তবে কি কবি ভিন্ন কোনো জগতের মহিমপুরুষ, যাঁর আলৌকিক স্পর্শে সমস্ত কিছুই সোনা হয়ে ওঠে? সম্ভবত তা নয়। যদি হতো, তা হলে মহৎ কবির সৃষ্টির প্রতিটি কেন্দ্র হীরকদ্যুতিময় হতো। নিজস্ব চৈতন্যের অস্থিরতা, পতন, তাঁর কবিতাকে যে ভাঙা পাথরে রূপান্তরিত করে, এই চরম সত্যটি যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা কুক্রিয়াশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট, সন্দেহ নেই। এই প্রয়াস পাঠক মানসকে যেমন বিভ্রান্ত করে, তেমনি সাধারণ মানুষকেও আক্রান্ত করে। কেননা কেউ জন্মলগ্ন থেকেই কবি হয়ে জন্মান না। চারদিকের প্রকৃতি, পরিপার্শ্ব তাঁকে অভিজ্ঞতা দেয়, জীবনকে জানতে দেয়। আর জীবনকে জানতে না পারলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না, শিল্পী হওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ, যাঁর প্রথম কবিতার উজ্জ্বলতম পংক্তি 'নয়ন তোমাকে পায়না দেখিতে, রয়েছো নয়নে নয়নে' এবং যে রচনার বয়সকাল মাত্র তেরো শুনে আমরা বিস্মিত, তাঁকেও কি বলা চলে তিনি স্বভাব-কবি? রবীন্দ্রনাথ

জীবনকে এবং জগতকে বাস্তবে যতোখানি জেনেছেন, যা স্বপ্নতাড়িত বিপর্যয়ে আক্রান্ত নয়, তার ফলশ্রুতি বিস্ময়করতার শিখা স্পর্শ না করলেই বরং আমরা বিস্মিত হতাম। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক পঠন-পাঠনে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তা বিস্ময়কর। আশি বছরের সীমানাবদ্ধ জীবনে তাঁর বিস্তৃত সাহিত্য-কর্মের নেপথ্যে সক্রিয় বিশ্ব-সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। কিন্তু যাঁরা আজকে বিপরীত স্রোতে মুখ ফিরিয়ে কবিতাকে শুধুমাত্র আবেগ-সর্বস্ব উত্তাল প্রবাহ মনে করেন, তাঁরা কবিতার মুখটিকে সামন্ত যুগে ফিরিয়ে দিতে চান। বর্তমান পটভূমিতে যেখানে পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে প্রতিটি সাহিত্যকর্মের অন্তরালে মানবতার বাস্তব অভিজ্ঞান অনুসন্ধান করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে আবেগাপ্লুত জোয়ারে মৌল চেতনার আচ্ছন্নতা কোনো-ক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না। সন্দেহ নেই, কাব্যে আবেগের মূল্য স্বীকৃত; কিন্তু অপরিমিত উচ্ছ্বাসের ফেনিল তরঙ্গ সত্যকে আঘাত করে, ভেঙে টুকরো টুকরো করে। কবিতা কখনো খণ্ডিত হীরক নয়, অখণ্ড হীরক। এবং সেই অখণ্ড হীরক থেকে যে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় তা সর্বকালীন। অথচ বর্তমানে যাঁরা কবিতায় এর প্রতিরোধে সক্রিয়, তাঁদের প্রয়াস কুক্রিয়াশীলতার ফলশ্রুতি মাত্র।

কবি যেহেতু সত্যদ্রষ্টা, সেহেতু তাঁর অবলোকন শুধুমাত্র কল্পনার পাখায় নির্ভরতা খুঁজতে পারে না। বরং সত্য ফলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক ধারা আশ্রয়ী হলে তাঁর পক্ষে মূল শেকড় স্পর্শ করা সম্ভব। তার অর্থ কিন্তু এ-ও নয় যে, কবি বিজ্ঞানের স্থূল অনুকৃতিতে কবিতাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেল-বেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের মতো কবিতারও একটি আলাদা চেহারা আছে। শিল্পগুণ বিচারের ক্ষেত্রে কবিতা বিজ্ঞানের মতো কোনো বিশেষ মানদণ্ড আশ্রয় করে না। তবে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে অনেকে কবিতাকে বিজ্ঞানের সমতা দানের কথা যে ভাবছেন না তা নয়। আমার মনে হয়, জীবনের প্রয়োজনে, সৃষ্টিকর্মের ওপরে যে কুয়াশার পর্দা টানিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে ভেঙে ফেলতে বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ স্বীকৃতি পেতে বাধ্য। কেননা আমাদের বোধ, বোধির প্রবলতম অংশ জুড়ে যে আবর্জনার বিস্তৃত ছায়াপাত, সে ক্ষেত্রেও কবিতাকে বিমুক্ত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে তুলতে বৈজ্ঞা-

নিক সত্যের সংযুক্তি অত্যন্ত জরুরী। আমরা কি চাই যে আমরা খুব রুক্ষ অন্ধকারে হারিয়ে যাই? কবিতা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্বে শুধুমাত্র স্বপ্নের বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে যাই? তা হলে কবিতা কেন, ঘুমের গভীর তলদেশে কিছু আলৌকিক সংঘটনার শিহরণ নিয়ে খুশী থাকলেই তো হয়! আমরা একই সঙ্গে দুই ধরনের বোধ বা উপলব্ধির অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই। কেননা সেখানে নিষ্কলুষ ফসলের প্রত্যাশা দুরাশা। কাব্যে ঔপনিবেশিক শাসন চলে না। কবি নিজস্ব সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, তবে তা প্রজাগণের হিতার্থে। যাঁরা কাব্যকলায় শুধু নিজের সাম্রাজ্যে একান্ত চেতনার নির্বাসনে বিশ্বাসী, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে। একটি লক্ষ্য চাই, সুপরিমিত সংযোজন চাই; যাকে বলা যাবে কবিতা, যাকে বলা যাবে জীবন। জীবন না হলে কবিতা হয় না। স্বপ্নের মধ্যে যে জীবনের অস্তিত্ব উত্তেজনার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে, তার অবস্থান অত্যন্ত অবাস্তব এবং ক্ষণিক। সুধীন দত্ত যখন চীৎকার করেন, স্বপ্ন কবিতা নয়, একই সঙ্গে তিনিই যখন 'নিখিল নাস্তি' বলে স্ববিরোধে (Self contradiction) তৎপর হন, তখন সে ক্ষেত্রে প্রথমটিকে তাঁর কবিতার বিশ্লেষণে মেনে নিলে কিংবা জীবনের প্রয়োজনে বুকে তুলে নিলেও, দ্বিতীয় চীৎকারের ঘোরতর বিরোধিতা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেননা যাঁরা স্বপ্নের জগত এবং বাস্তব জগতের মধ্যেকার ব্যবধানকে অনেক সময় সমরেখায় এনে দাঁড় করান, তাঁদের পক্ষেই একই সঙ্গে স্বপ্নচারণার বিরোধিতা এবং 'নিখিল নাস্তি'র উচ্চারণ সম্ভব! অথচ সুধীন দত্তের প্রথম উচ্চারণকে অস্বীকার না করে শুধু দৃষ্টান্ত হিশেবে উপস্থিত না করলেই বা উপায় কি!

আসলে প্রতিটি কবির ভেতরে যে দ্বন্দ্ব এবং আত্মসংঘর্ষ, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত তার সুস্পষ্ট রূপ তুলে ধরা অসম্ভব। তা না হলে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে পাশ্চাত্যের বিরূপ ভাবনাকে সত্য বলে মেনে নেবো কেন? এই আপসমুখিনতার পরিবর্তন সম্ভব হলে কবিতার সত্য এবং বিজ্ঞানের সত্যে কোনো বিরোধের অস্তিত্বই স্বীকৃত হবে না।

কবিতায় পরিমিতিবোধ

পরিমিতিবোধ শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয়, জীবনেও একটি প্রসন্ন অধিকার স্থাপন করে আছে। আমার চলা অথবা আমার বলা, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোকনা কেন, পরিমিতিবোধ ব্যতীত অগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ অসম্ভব। বিশেষত কাব্যক্ষেত্রে এ-তো স্বতসিদ্ধ। কবিতা যেহেতু আলৌকিক অস্তিত্বের ধারক নয়, সেহেতু জীবনের মধ্যেই তার উদ্ধার, বিস্তৃত জীবনেই তার ক্রম অভিসার। কুমার যেমন করে মাটির প্রতিমা গড়ে, কাঠামো আর মাটির কৌশলে সৌন্দর্য আরোপ করে, তেমনি করে কবিকেও চেতনার গহনে একটি একটি করে ভরে দিতে হয় সৌন্দর্যের সুন্দরতম ফুল। যে কোনো রকম পদস্খালন অথবা বিচ্যুতি কবিতার সৌন্দর্যকে হত্যা করতে পারে। এ কারণেই কবিতায় পরিমিতিবোধের সংস্থিতি অনিবার্য।

আসলে মহৎ সৃষ্টিকর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই সত্যকে ধারণ করে আছে। কোথাও কোনো বাড়াবাড়ি নেই, উচ্ছ্বাসের উন্মাতাল অহংকার নেই। যেখানে যতোটুকু দরকার, সেখানে ততোটুকু প্রয়োগ করা হয়েছে। মনে হয়, যেন প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উপমা এ ক্ষেত্রে অনিবার্য। কবিতায় পল্লবিত অনুভবের প্রাধান্য থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিচেতনায় পতনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় এবং বাস্তবে ঘটেও তাই। ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মাতাল শব্দকে, বলা যায় কবিতার বৈতরণীকে বহুদূর পেরিয়ে নিয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ কবিচেতনা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ভাষা ভাবের অনুগামী না হয়ে যেন ভাবকে অতিক্রম করে যেতে চেষ্টা করে। ফলে তখনই কবিতার শব্দমালা ঝম ঝম করে ঝরে পড়ে। বাঁধনহীন উত্তেজনায় পরিমিতিবোধ হারিয়ে যায়। আমি এটা বুঝে উঠতে পারি না, কবিরা অতি সহজেই দাসত্বে আবদ্ধ হন কেমন করে? অলৌকিকত্বের কাছে আভূমি আনত হয়ে

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কি তাঁদের মানায়? কবির হৃদয়ে আবেগ থাকবে সন্দেহই নেই। কিন্তু সে তো কাব্যিক আবেগ। কাব্যিক আবেগ এবং বাস্তবতার আবেগ একার্থে অভিন্ন হলেও, ভিন্নার্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা ব্যক্তিক আবেগ যখন কবি হৃদয়কে আপ্লুত করে, তখন কবিজীবনে দুর্ঘটনা সহসঙ্গী হতে পারে। কিন্তু কাব্যিক আবেগ কবির মহৎ সৃষ্টিকর্মের প্রতিফলনে সহায়তা করতে পারে। যদিও অতিমাত্রিকতা উভয়ত ক্ষতিকারক।

আসলে কবিতায় ছন্দ এবং অলংকারের অস্তিত্ব এ কারণেই। ছন্দ মানেই বিভিন্ন ব্যাপারে পরিমিতিবোধ। অলংকারের অস্তিত্ব কাব্যসুষমা এবং তার সংহত উপস্থাপনার জন্যে। যে কোনো ভাবের যে কোনো অনুসঙ্গী বা ছন্দ হতে পারে না। অর্থাৎ আবেগ প্রকাশের জন্যে ছন্দের বৈচিত্র্য রয়েছে। বহুবিধ ছন্দ আশ্রিত বহুবিধ ভাবের প্রকাশে। সাধারণ, ভাবগম্ভীর চৈতন্য-প্রতিকৃতির প্রতিফলনে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার। অপেক্ষাকৃত এলানো ভাবের প্রকাশে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার এবং হালকা ও চটুল ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বরবৃত্ত যথাযোগ্য বাহন। এর বৈপরীত্য অথবা এ থেকে কেন্দ্রবিচ্যুতি কবির কাব্যচেতনাকে খণ্ডিত করে, টুকরো টুকরো করে। কবি-চেতনার পরিমিতিবোধ ছন্দ ব্যবহারের যথার্থ বিশ্লেষণের ওপরেও নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কাব্য বিশ্লেষণে শুধুমাত্র ছন্দই নয়, কিংবা অলংকারই নয়, তার সামগ্রিক গহনতা স্পর্শ করে মূল সত্যকে নির্দিষ্ট করে দেখাই পরিমিতি কিংবা সংহতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরিমিতিবোধের অভাব কবির পতনের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবি যদি আলোকিত অস্তিত্বের ধারক না হন, তাহলে কাব্যের লাগাম টেনে ধরার ব্যাপার কখনো সুষম হতে পারে না। যদি এটি 'কমন' হতো, তাহলে অবশ্য এ প্রসঙ্গটি ভিন্নতর দিক নির্দেশ করতো। কবির ভাব বা ভাবনায় পতন যতোদূর পর্যন্তই প্রসারিত অথবা সংকুচিত হোকনা কেন, প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি যেহেতু সচেতন, সেহেতু সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি কবি-চেতনার শক্তি সম্পর্কেও সন্দিহানতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত বর্তমান সময় প্রেক্ষিতে কবিচেতনা শুধু আবেগ বা স্বপ্ন তাড়িত নয়। ফলে মৌল প্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুতি কোনোক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না।

আধুনিক কবিতা প্রধানত বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনার ফসল। এ ক্ষেত্রে স্বভাব কবিত্বের সাশ্রয়ের প্রশ্ন অবান্তর। অতএব যেখানে বুদ্ধিই প্রধান, সে ক্ষেত্রে যুক্তি অনিবার্য। বলা যেতে পারে যে, কাব্যের সামগ্রিকতাকে কি সব সময় যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি উপস্থাপন করা না গেলেও এটা সত্য: আজকের কবিতার অন্তর্নিহিত বাণী উন্মোচন অবশ্যই যুক্তি আশ্রিত, বাইরের দেহ গঠনে আবেগের পরিচর্যা বিরুদ্ধাচরণের আওতায় পড়ে না। বরং সে ক্ষেত্রে তাকে স্বাগত জানানো অনিবার্য তাগিদ হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ: যদি কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে না-ও পারা যায়, তাতে ক্ষতি নেই, যদি কবিতার বহিসৌন্দর্য পাঠক-মানসকে উদ্বেলিত করতে পারে, তবে তার মূল্যও কোনো অংশে কম নয়।

সন্দেহ নেই যথার্থ পাঠক কবিতার বহিসৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ, একই সঙ্গে তাঁর প্রাণনার মৌল লক্ষ্য কবিতার হৃদয়স্পর্শের দিকেও। ফলে সেখানে যুক্তির প্রশ্নটি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই যুক্তিহীনতাই আমাদের অধিকাংশ কবিতার মর্মার্থ। এর কারণও নিহিত প্রয়োগ এবং প্রকাশের অপরিমিত যথেচ্ছাচারের ভেতরে। যিনি যুক্তি মানেন, তার কাছে আবেগের চেয়ে যুক্তির মূল্যই বেশী। যারা কবিতার আবেগকেই প্রধান মনে করেন, তাঁরা আসলে ভীরু, ভানসর্বস্ব; যুক্তিতে তাঁরা ভয় পান! তাঁদের সৃষ্টিকর্ম অর্থাৎ কবিতা আবেগের ফেনিল উচ্ছ্বাসে হাওয়ায় ভাসমান হয়ে পড়ে। এই ক্ষমতাহীন দাপটের প্রকাশকে স্বাভাবিক বলে প্রমাণ করার জন্যেই কাব্যক্ষেত্রে কারো কারো আত্মপ্রতারণা সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। তাই কাব্যের পরিমিতিবোধে তাঁরা বিশ্বাসী নন। অথচ পরিমিতিবোধ ব্যতীত কবিতা শিল্প হিশেবে স্বীকৃতি পাবার অযোগ্য।

সবচেয়ে বড় কথা, কবিতাকে বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদন হিশেবে ভাবতে যাওয়াই বিভ্রান্তিকর। কবিতা তো আসলে সৌন্দর্য-চেতনার বহিপ্রকাশ। দেখা যাবে, যেখানেই সৌন্দর্যবোধের শূন্যতা, সেখানেই পরিমিতিবোধের অভাব। তাই শূন্যতা পূরণের ব্যর্থ চেষ্টা, শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহার, আবেগের লাগামহীন ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতিতে কাব্যের হৃদয় ভারাক্রান্ত। মহৎ কবি-

দের কবিতায় শব্দের ব্যবহার যেখানে ভাব প্রকাশের তাগিদে, সেখানে আবেগপ্রবণ কবিদের আবেগ-সংক্রামন ভারসাম্যহীনতার জন্যে। কাব্য-ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যহীনতার অন্তর্নিহিত কারণ অপরিচিত পদক্ষেপ। যদি কবিতা শুধুমাত্র ভাবের বাঁধনহীন প্রকাশ অর্থ্যাৎ 'spontaneous overflow of powerfull feelings' হতো, তা হলে মহৎ কবিদের সৃষ্টিকর্মে বার বার পতন অনিবার্য হয়ে উঠতো।

এ কথা সুনিনিশ্চিত, যে কোনো সৃষ্টিকর্মই হোক, পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করে তা কখনো সম্ভব নয়। হাজার বছর আগের বৈষ্ণব পদাবলীর অমর বাণীবিভূতি যে আমাদের হৃদয়কে আজো আন্দোলিত করে, তার কারণ তার সংহত সৌন্দর্য। যদি তা শুধু অপরিমিত আবেগ হতো, তবে তা শতাব্দী-অত্যয়ী পাঠক মানসে কোনো রকম আলোড়ন তুলতে সক্ষম হতো না। এর অন্তর্নিহিত কাব্যসত্য সংস্থিত সৌন্দর্যে এমন মূর্ত করে রাখা হয়েছে যে, তাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হৃদয়ে স্থান দেয়া চলে।

বর্তমান যুগে যখন আমাদের পরিপার্শ্ব অর্থনীতি-স্পৃষ্ট, তখন কাব্যের প্রেরণাকে আমরা নিছক আবেগের ভারে আপ্লুত করতে চাইলে তা কোনোক্রমেই সত্য উন্মোচন হবে না। অথচ কবিতার মৌল প্রেরণা সত্যম সুন্দরম। যারা এই প্রতিক্রিয়া বিমুক্ত মধ্যপ্রক্ষেপে সচেষ্ট, তারা আত্মপ্রতারক তো বটেই, এমনকি যুগ-বিচ্ছিন্ন।

কবিতা রচনার অন্তর্বৃত সত্যে এই স্বাভাবিক স্বীকৃতি না থাকলে তা উপচিয়ে পড়বে, কিন্তু যে পরিমিতিবোধ কবিতাকে যথার্থ কবিতা হিশেবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, পাপড়ি মেলতে সহায়তা করতে পারে, তা কখনো সম্ভব হবে না।

কবিতায় অলংকৃতি: পরিমিতিবোধের শর্ত

কবিতায় অলংকৃতি প্রধানত স্রষ্টার পরিমিতিবোধ ও সংহত অনুভবের আত্মপ্রকাশের ওপর নির্ভরশীল। যে কোনো স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের সার্থকতার নেপথ্যেও সক্রিয় এই অনিবার্য নিয়ম, যা হৃদয়ের মূল শেকড় থেকে ধীরে ধীরে উৎসারিত। এর ব্যতিক্রম অথবা অনভিপ্রেত আলোড়ন বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। ফলে সৃষ্টিকর্মের পতন ঘটে। সৃষ্টিকর্মের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই বৈপরীত্যেরই অন্য নাম ভাবাবেগ। সত্য যে, কবিতা এমন একটি শিল্প, যেখানে আবেগ এবং অনাবেগ, অনুভূতির সংযোজন অনিবার্য শর্ত। কিন্তু এই সংযোজনের সার্থকতা নির্ভর করে কবির প্রয়োগকুশলতার ওপর। যদি কবি অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন, তা হলে কবিতা হয়ে ওঠে কতিপয়ের বিলাসী হাতিয়ার, যা চৈতন্যালোকে প্লাবন তোলে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনুভূতির অনাবেগ অবলোকন নির্বাসিত হয়। অথচ যে কোনো শিল্পেরই প্রতিবেদন এই অযৌক্তিক সত্যের বিরোধী। বাস্তবত কবিতায় অলংকৃতি তখনই ব্যাপকতা লাভ করতে সক্ষম হয়, যখন কবি শিল্পকে জীবনের অনুষঙ্গ বলে মনে করেন। যাঁরা পরশ্রমজীবী মানসতার ধারক, তাঁরা মূলত বৃহত্তর মানসতার বিরুদ্ধে সক্রিয়। ফলে সৃষ্টিকর্মে অকারণ শাব্দিক কসরত, অলংকৃতির নামে দুর্বোধ্যতা তাঁদের মনোবিলাসের প্রধানতম অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। অনস্বীকার্য, জীবনের পরিপার্শ্বে, সামাজিক অস্তিত্বে প্রতিমুহূর্তে যে বহুবিধ ঘটনা কবি-চেতনায় সংক্রামিত হয়, তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী, বহুরূপী অভিজ্ঞতা দুর্লভ নয়। কিন্তু কবি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সূক্ষ্ম মানসতার ধারক। এ কারণে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে যথার্থ সত্যের উদঘাটন তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। যদি কবি-হৃদয় বৃহত্তর মানস-

তার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে, তবে এটা নিশ্চিত, কবি কুক্রিয়াশীলতার সপক্ষে সচেতন স্বৈরাচারে প্রবৃত্ত। কেননা কবির হৃদয়কোরকে যে সুরভী তা কখনো নষ্ট হতে পারে না। অবশ্য তার অর্থ এ-ও নয় যে, কবি-মানসতার বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির স্বরূপ অভিন্ন না-ও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। মুসোলিনীর কুশলী চক্রান্তের আবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ফ্যাসিবাদের সপক্ষে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের বিভ্রান্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। মুসোলিনীর চক্রান্তের অন্তর্নিহিত কারণ উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে কঠোর শব্দ বিন্যাসে কুণ্ঠিত হননি। বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আর একজন বিতর্কিত কবি-ব্যক্তিত্ব এজরা পাউণ্ড। প্রখ্যাতির ব্যাপ্ত, বিতত ও বিস্তৃত শিরোপা ধারণ করেও আজীবন ফ্যাসিবাদের সমর্থক এই কবিও বিভ্রান্তির চরমতম অন্ধকারে আবর্তিত। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ অথবা এজরা পাউণ্ডের বিভ্রা-ন্তির স্বরূপ অভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা : মানুষের, মনীষার, প্রকৃতি ও পৃথিবীর, যেখানে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে অথবা 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি' এক সর্বগ্রাসী প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে ওঠে, জীবনের সাথে কবি-চেতনার গাঢ়তর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট করে তোলে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে হলেও। কিন্তু এজরা পাউণ্ড আজো দূরদ্বীপবাসী, বিতর্কিত মানসতার ধারক। তাঁর কবিতা অভিযুক্ত দুর্বোধ্যতার প্রতিফলনে। তিনি বিভ্রান্ত মন ও মননে, প্রকাশে ও বিকাশে, এমনকি ব্যক্তিজীবনে। এই বিভ্রান্তি কি তবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার সচেতন প্রয়াস? কিন্তু আমার মনে হয়, যে কোনো মহৎ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির প্রকাশেই স্বতন্ত্র অভিধা লাভে সক্ষম। ফলে আরোপিত স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস শুধু বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি নয়, আত্মহননী পথ আবিষ্কারের পদক্ষেপ মাত্র। আত্মশক্তিতে যাঁদের সন্দেহ আছে, তাঁদের পক্ষেই নিজেকে আড়াল করার প্রয়াস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই প্রয়াসের চেহারা বহুবিধ। ব্যক্তিক প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও সৃষ্টিকর্মের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে তার স্বাক্ষর দুর্লক্ষ্য নয়। কবিতায় অনাবশ্যক অলংকৃতির অবভাস এই প্রয়াসের অন্যতম স্বাক্ষর। সত্য,

কবিতায় অলংকৃতি তার সার্থকতার সমর্থক। কিন্তু কবি চৈতন্যের সংহত, শীলিত ও পরিমিত প্রয়োগের ওপরেই তা নির্ভরশীল। যেহেতু কবিতায় আবেগের প্রাধান্য, উচ্ছ্বাসের অঙ্কন, সেহেতু যে কোনো অতিমাত্রিক ঝোঁক কবিতার পতনকেই অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, কবিতার ব্যর্থতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। মূলত মহৎ সৃষ্টিকর্ম অনাবশ্যক অলংকৃতির ভারে ন্যুব্জ নয়, শব্দের ঝাঁঝালো চীৎকারে ক্লিষ্ট নয়। কোথাও কোনো অর্থহীন শব্দ কিংবা বৈতালিক সুরের সংযোজন নেই। যেখানে যতোটুকু প্রয়োজন, সেখানে ততোটুকুই সংযোজিত। 'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে, সহজ করে যায় না লেখা সহজে' আমার মনে হয়, মহৎ কবিতার মৌল প্রাণনা রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিদ্বয়ের ওপর নির্ভরশীল।

যেহেতু ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম, সেহেতু শব্দেরও সীমাবদ্ধতা আছে। শব্দ জড়, নিষ্প্রাণ; ভাবের আত্মপ্রকাশের বাহন। যখন অনুভব আন্দোলিত হয়, সমাজ, পরিপার্শ্ব কখনো কখনো বিমূর্ত বিস্ময়ে জেগে ওঠে, হৃদয়ের কপাট উন্মোচিত করে বেরিয়ে আসে উপলব্ধির গাঢ় রসায়ন, তখন শব্দও কেঁপে ওঠে, জেগে ওঠে, ভাবকে পুরে নেয় দেহের কাঠামোতে। যে কবির শক্তি সর্বগ্রাসী, তিনিই যথার্থভাবে শব্দের সার্থক ব্যবহারে সক্ষম হন। বিভিন্নভাবে শব্দকে নাচিয়ে বেড়ান। কবিতায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ ও অলংকারের অবভাস মূলত শব্দকে শক্তি দানের প্রয়োজনে। পূর্বেই বলেছি, শব্দের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু তবুও এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সীমাহীন কল্পনাকে আটকে রাখার প্রয়াস চলে। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যে কবি অসীমের ব্যাপক অংশকে সার্থকভাবে ধারণ করতে সক্ষম, তিনিই মহৎ কবি। এ ক্ষেত্রে একের মধ্যে বহুর প্রকাশই আসল কথা। অবশ্য অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিদের অনেকেই কবিতায় বিচিত্র কারুকাজের ভিন্ন ভিন্ন দিকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। সেখানে সীমাবদ্ধতা তীব্র, অক্ষমতাও কম নয়। বিহারী-লাল কবি হিশেবে রাবীন্দ্রিক 'শিশু মানসতায়' প্রথমত বিরাটত্বের মহিমায় ভাস্বরতা লাভ করলেওতাঁর অসম্পূর্ণতা ছিলো 'দেখিতে পারি, দেখাইতে পারিনে', এই অনুভবের মধ্যে। 'উপমাঃ কালিদাসস্য' এই বক্তব্য উপ-স্থাপন করে যাঁরা কবিতায় উপমা প্রয়োগ, অলংকরণে সচেষ্ট, তাঁরা এই

শব্দের বাইরের দিকে যতোখানি আগ্রহী, ভেতরের দিকে ততোখানি আগ্রহী নন। আর এ কারণেই শুধুমাত্র অলংকৃতির সার্থক কারিগর হিশেবে প্রধানত কালিদাসের 'মহাকবি' শিরোপা লাভ যৌক্তিক নয়। ছন্দের যাদুকর হিশেবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি বিশেষ দিকের সার্থক ধারক হওয়া সত্ত্বেও সার্থক কবি-স্বীকৃতি লাভে অসমর্থ। প্রকৃতপক্ষে কবি-সার্থকতা নির্ভরশীল খণ্ডিত, কিংবা কৌণিক উজ্জ্বলতায় নয়, সামগ্রিক প্রতিফলনে। সন্দেহ নেই, ক্ষেত্র-বিশেষে বিশিষ্টতা থাকলেও পরিমিতিবোধের অভাবে তা সার্থক নয়। স্মরণ্য যে, অলংকৃতি কবিতায় অবভাসিত হলেও কবির দায়িত্ব সেখানে ব্যাপক। অলংকৃতির ভার যাতে কবিতার সৌন্দর্য ব্যাহত না করে, সে জন্যে সংহতি, শীলিতি ও পরিমিতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত কবিতায় অলং-কৃতি সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক অলংকরণে কবিতার প্রাণ স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। কবিতার অন্তরে যে অনুভব দুলে ওঠে. অতিমাত্রিক অলংকরণে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ফলে তখনই পাঠক-মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যেহেতু অলংকারের ভার অত্যন্ত তীব্র এবং পরিমাণ অনুভবের চেয়ে বেশী, সেহেত তার প্রয়োগ সম্পর্কে খেয়ালের সুযোগ নেই। অনুভবে আবেগের সুযোগ থাকে, কিন্তু প্রকাশে তা থাকে না। বাইরে যুক্তিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুগ্রাহ্যতা ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম পালন অনিবার্য শর্ত আরোপ করে। অলংকৃতির আওতায় নির্ধারিত শব্দ, ছন্দ, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি। কোনো বিশেষ কবিতায় এর সর্বতো-প্রয়োগ নির্ধারিত নয়। তবে এর কোনো কোনোটি কবিতা-কাঠামোর মূল ভিত্তি। এ থেকে বিচ্যুতি অক্ষমতা সুস্পষ্ট করে তোলে। তখন স্বেচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতা স্বৈরাচারী অবয়ব নিয়ে ধরা পড়ে। অবশ্য এর আর একটি কারণ পাঠক সম্পর্কে কবির নেতিবাচক মনোভঙ্গী। এই মনোভঙ্গীর উৎসকেন্দ্র হতাশা অথবা জীবন সম্পর্কিত নৈরাশ্যের গভীরে সংস্থিত। ফলে জীবন, সমাজ পরিপার্শ্ব ও পৃথিবীকে বস্তু ও ভাবের মধ্যবর্তী শূন্যতার লেন্সে ঝুলিয়ে রেখে আত্মপ্রসাদ অথবা আত্মতৃপ্তি লাভের ভয়ংকর নেশায় আপ্লুত তাঁরা। আর এই আচ্ছন্ন নেশার মধ্য থেকে সুস্থিত বিশ্লেষণ অসম্ভব। এই অনভি-প্রেত চতুরালিই অধিকাংশ কবির কবিতাকে একটা নৈরাজ্যিক আকৃতি দান

করেছে। বস্তুও নয়, ভাবও নয়-এর মাঝামাঝি সহাবস্থান থেকে অনুভবকে শব্দের অথবা ছন্দের কাঠামোতে ভিত্তিত করলেও, সেখানে বিচ্যুতি অনিবার্য। অতিমাত্রিক ঝোঁক, ঝাঁঝালো শব্দের ব্যবহার, অপটু ছন্দের প্রয়োগ অর্থাৎ নিটোল অলংকৃতির অবভাস তাই অসম্ভব।

এ কারণেই কবির চেতনালোকে সেই আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ প্রয়োজনীয়, যা স্বপ্নের আলো ছায়ার ভেতরে সংস্থিত নয়, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার, পরিপার্শ্বের বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত। তাই হৃদয়ের গভীরে চেতনার শেকড় প্রোথিত করে রস সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেই পতন নয়, উত্থান স্বাভাবিক হবে। বস্তুর স্পর্শে জীবনের মৌলসঙ্গীতের সুর হৃদয়ে ধারণ করাও সম্ভব হবে। তখন শুধু কৌণিক অথবা অলৌকিক অনুভবের তাড়িত উন্মাদনায় আক্রান্ত না হয়ে কবি নিজেকে প্রসারিত করবেন ব্যাপ্তিতে,-বিস্তৃতিতে। ফলে প্রসারিত অনুভবের তলদেশ থেকে যে ফসল মাথা তুলে দাঁড়াবে তা জীবনের বিরুদ্ধে নয়, জীবনের সপক্ষে সাহসী ঘোষণায় নির্দ্বিধ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নিশ্চিত এবং তখনই কবিতা তার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। কবিতায় অলংকৃতির যে ভারসাম্যহীনতা কবিকে সার্থকতার মুকুট পরিয়ে দিতে পারে না তা স্বাভাবিকভাবেই দূরগামী হয়ে যাবে। কবিতা রচনায় এই সত্যের দিকে দিক্‌পাত না করলে কবিতা শুধুই অর্থহীন শব্দ বিন্যাস হয়ে উঠবে, রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ সঙ্গীতের উচ্চারণ সেই 'সহজতার' স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে না।

কবিতার ছন্দ ও তার নিয়ম বন্ধন

একটানা দুস্তর পথ অতিক্রম কী রকম একঘেয়ে, প্রাণহীন, ক্লান্তিময় প্রতিক্রিয়া ; ফলত প্রবল হতাশা। কিংবা সঙ্গীত ক্রমাগত তালহীন উচ্চারণ হয় যদি ; তবে তাও সেই একই পর্যায়ভুক্ত। আসলে প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মুহূর্তই তাই। আর এ কারণেই অবসর, মধ্যবর্তী অবকাশ যাপন। প্রতিটি বিষয়ে, ঘটনায় তাল আছে, যতি আছে, ছন্দ আছে। এ থেকে বিচ্যুতি সৌন্দর্যকে যেমন হত্যা করে, তেমনি বৈশ্বিক নিয়মের ধারাবাহিকতাকেও অস্বীকার করে, এ প্রবণতা দুর্বিনীত হলেও যথার্থ নয়। ফলে পরিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। সৌন্দর্য রক্ষার তাগিদে যেমন, তেমনি বৈজ্ঞানিক সূত্র ধারণেও প্রতিটি ব্যাপারেই নিয়ম মানতে হয়, ছন্দের বন্ধনে আবৃত হতে হয়। আর কবিতার ব্যাপারে এ সত্য আরো বেশী স্বতসিদ্ধ। কবিতা কি তবে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বন্ধনে সীমাবদ্ধ ?

অবশ্যই তাই। কিন্তু সে নিয়মবন্ধন বাহ্যবস্তুর মতো। স্থূলার্থে নয়। অনিয়মের মধ্যে নিয়মের যে অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত থাকে, তেমন আর কী। বৃহৎ রাজপথের সাথে এ জাতীয় নিয়ম-অনিয়মের তুলনা করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে বৃহৎ রাজপথে চলমান যানবাহনের ছুটোছুটি, মানুষের চলাচল অর্থ্যাৎ সম্পূর্ণ দৃশ্যকে ভয়ানক অনিয়ম বলে মনে হলেও, লক্ষ্য করা যাবে, ওরই মধ্যে নিয়মের একটা অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রয়ে গেছে, যাকে প্রতিনিয়ত মেনে চলছে চলমান অনিয়ম। কবিতার নিয়মবন্ধনেও এ জাতীয় সীমাবদ্ধতা আছে।

সন্দেহ নেই, যিনি যথার্থই কবি, তিনি পূর্ববর্তীকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের নতুন পথ নির্মাণ করতে পারেন। আর সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস যেহেতু প্রধানত আঙ্গিক বদলের ইতিহাস, সেহেতু কবিতার ক্ষেত্রেও তার শরীর-

পরিবর্তন মানে ছন্দস্রোতকে ভিন্নতর পথে প্রবাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে কবিতায় ছন্দই আসল কথা। মনোলতার শেকড় প্রসার করা, সে সম্ভব অনেকাংশে। যেহেতু কল্পনার লাটাইয়ে সুতোর দীর্ঘতা অনন্ত, সেহেতু সেখানে কল্পনার চেয়ে ছন্দের অর্থ্যাৎ কবিতার কাঠামোই আসল কথা। কেননা কল্পনার বিশালতাকে বাইরের আবরণে ধরে রাখা সম্ভব কতোটুকু? এ ক্ষেত্রে বিন্দুতে সিন্ধুর উপমা খাটে না। এ উপমার অর্থ ব্যাপক। ভাষা বিন্দু, এ পরিমাপ সঠিক নয়; তেমনি কল্পনা সিন্ধু, এ মতও গ্রাহ্য নয়। আসলে প্রকৃত অর্থে কোনো শব্দেরই বিকল্প নেই; বিশেষত তা যদি ভাবগত পরিচয়কে উন্মোচিত করতে চায়। অতএব ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্যেই আশাবাদী কবিদের পথ অতিক্রম করতে নতুন দিকন্মোচন করতে হয়েছে। মাধ্যম বেরিয়েছে বহু। একই গন্তব্যে পৌঁছতে যেন বহুতর পথ আবিষ্কার। এ প্রচেষ্টা যে শুধু ভাবের অভ্যন্তর স্পর্শ করেছে তাই নয়, তা ক্রমাগত ছুঁয়ে গেছে স্তরে স্তরে কবিতার বিভিন্ন প্রান্তর। তাই কবিতার প্রকাশ-মাধ্যম, ছন্দেও বহু বিচিত্র দোলা, অসংখ্য রঙের সমাহার।

ছন্দ কবিতা-সৌন্দর্যের প্রাণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অলংকরণের যে নিখুঁত সমাবেশ ঘটে, তাকে অস্বীকার করা চলে না। এক নয় দুই, দুই নয় তিন, এক এক করে ছন্দ আবিষ্কারের মাধ্যমে ভাবনা কল্পনাকে ভিন্নতর পথে পরিচালিত করা যেতে পারে। এতে কবিতা ঋজু হয়, তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাকে অস্বীকার করে কবিতা লেখা হলেও তা যথার্থ অর্থে শিল্প স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয় না। এ কারণেই কবিতায় নিয়মবন্ধন স্বীকার করে নেয়া। কবিতার নিয়মবন্ধন মানেই তার ছন্দ। ছন্দ বলতে আমি অন্তমিল বোঝাতে চাইছি না। আধুনিক কবিতার অধিকাংশই অন্তমিল রক্ষা না করেও কবিতা। কিন্তু তা কি তবে ছন্দ-বিমুক্ত? কোনো সচেতন কবিতা পাঠকই বোধহয় এটা স্বীকার করবেন না। আর কবিদের ব্যাপারে তো কথাই নেই। যে কোনো আধুনিক কবিই স্বীকার করেন, অন্তমিল না থাকলেও কবিতায় ছন্দ থাকে। কিন্তু এই বিশ্বাসে এবং বাস্তবে ব্যবধান যখন প্রবল হয়, তখনই সাধারণ পাঠকের মনে দ্বন্দ্ব জাগে, কবি হৃদয়ের কনট্রাডিকশন ধরা পড়ে।

আধুনিক কবিতায় ছন্দ আছে, ছন্দবৈচিত্র্য আছে, ছন্দকে ভেঙে, টুকরো করে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন কেউ কেউ। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত প্রধানত এই ছন্দত্রয়কে বাহন করে এ পর্যন্ত কবিতার ছন্দ পরিবর্তন ঘটেছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছেন অনেকেই। কিন্তু ছন্দকে অস্বীকার করে কবিতা রচনায় সমর্থ হননি কেউ। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের ক্ষেত্রে বহু বাঁক পেরিয়েছেন, কিন্তু তাকে অস্বীকার করেননি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরিচিত ছন্দের যাদুকর হিশেবে, ছন্দ দুলিয়ে দুলিয়েও নিয়মকে, অপ্রকাশ্য বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনিও, আরো বেশী করে। যাঁরা মনে করেন কবিতায় স্বেচ্ছাচারিতা চলে, অবাধ রাজত্বের প্রবল উচ্ছৃ-ঙ্খলতা চলে, তাঁরা আসলে কবি নন, দৈত্য। নিয়ম মানবো না, এমন সিদ্ধান্ত অস্বীকৃত না হলেও এ ব্যাপারে মাত্রাজ্ঞান থাকা অনিবার্য। এ নিয়ম না মানা যতোদুর পর্যন্ত তার রেখা টানতে পারে, তারই ওপর নির্ভরশীল এর সবটা। কবিতাকে একটি মাত্র ছন্দের আওতায় ধরে না রেখে নতুন ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টির অনিয়ম অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু তা যদি ছন্দকেই অস্বীকার করতে চায়, তবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য নয় স্বাভাবিক কারণেই। কল্পনার প্রকাশে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকতে পারে, যা আছে নজরুলে, কিন্তু তা-ও ছন্দের শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে 'কবিতা'এ স্বীকৃতি যেমন ত্রয়ী অক্ষরের গ্রন্থনায়, তেমনি ত্রয়ী মাত্রাও ছান্দিক নিয়মানু-সারে। এ ছাড়া অন্তর-দ্যোতনাও পরোক্ষ নিয়মবন্ধন-প্রযুক্ত। সাম্প্রতিক আধুনিক বাঙলা কবিতায় অধিকাংশ ঝোঁক অক্ষরবৃত্তিক। এর কারণ হতে পারে দুটো। এক : ছন্দ সম্পর্কিত অজ্ঞতা। দুই : অক্ষরবৃত্তিক কবিতাকে ছন্দবিহীন কবিতা ভাবার আত্মপ্রশান্তি। স্পষ্টত ছন্দ না হলেও চেতনাকে যে কোনো প্রকারে কাঠামো দান করতে পারলেই তা অক্ষরবৃত্তিক একটা আপাত রূপলাভ করে। কিন্তু তা যে আসলে অক্ষর বৃত্ত ছন্দ নয় এবং তার বিশ্লেষণের মাপকাঠিও নয়, এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ছন্দের প্রকৃত দর্পণে প্রতিবিম্বিত হলে। এমনকি সে প্রসঙ্গ বাদ দিলেও সাধারণ দৃষ্টিতেও কবিতার দেহপল্লবে কোনো সঙ্গীত মূর্ত হয়ে ওঠে না। একটা ম্লান, বিপর্যস্ত, জীর্ণ পরিচয় সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যে নিপুণ মুদ্রা নৃত্যের প্রতিটি

পদসঞ্চালনে সক্রিয় থাকে, তার একটির পতন কিংবা স্খালন যেমন সম্পূর্ণ নৃত্যকে হীনসৌন্দর্য করে তোলে, কবিতায় ছন্দবিহীনতাও তাই। বাইরে ছন্দের পেখম না মেললেও ভেতরে তার সৌরভ অনুভব করা যায় কিনা, তার ওপরেই আধুনিক কবিতা নির্ভরশীল। পূর্বে বহিছন্দই যেখানে প্রধান ছিলো, সেখানে সমস্যা ছিলো সংকুচিত। কথা এবং দোলা এই দুটো অস্তিত্ব ভারী পাথরের মতো চেপে বসলেও ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু এখন তা ক্রমাগত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ছন্দের ব্যাপকতা আরো গভীর করে তুলেছে।

অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিক আধুনিক বাঙলা কবিতায় ছন্দ-সম্পর্কিত অসচেতনতা কতো তীব্র। এর কারণ কি তবে পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত? স্মরণ্য যে, এই ঐতিহ্য কেবল মাত্র মৃত্তিকা-উত্থিত, নরম, কোমল জলবায়ু প্রভাবিত। যদি তাই সত্য হয়, তবে তা ক্ষমাহীন এ কারণে যে, কবি সমাজের সবচেয়ে সচেতন কারিগর, শুধু কল্পনায় নয়, প্রকাশেও। ফলে আবেগ-তাড়িত প্রতিক্রিয়া শরীর-সম্ভ্রমকে অতিক্রম করে ভুল পথে পা বাড়াবে, এটা গ্রহণীয় হতে পারে না।

নিয়ম মানা হোক বা না হোক, সত্য যে, কবির নতুন অভিযাত্রা, তা কোনো-মতেই শুধু আবেগ ভিত্তিক হলে চলে না। বিশেষত, বর্তমান বিশ্বে কাঠামো স্থাপনে এ জাতীয় প্রভাব শুধু কবির দুর্বলতা নয়, তাঁর ব্যর্থতারও পরিচয়-বাহী। দেখায় ভিন্নতা থাক, ক্ষতি নেই। লেখায়ও ভিন্নতা স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত নয় ছন্দ নিয়ে অন্তর-স্বেচ্ছাচারিতা। এ ক্ষেত্রে ছন্দই নিয়মবন্ধন। যে কোনো রূপে, স্বরূপে, অরূপে। যদি একে কেউ ভিন্ন নামে অভিহিত করতে চান, তবে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু তা কোনোক্রমেই অন্তর্বৃ'ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিচ্যুতি হতে পারে না।

মধুসূদন: মোহনামিলিত নাবিক

মধুসূদন কবি, সত্য। কিন্তু এ শিরোপাই তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের বিশ্লেষণে যথার্থ নয়। কারণ মধুসূদনের চেতনার অন্তরালে রয়েছে এক বিশাল বলয়, যা উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশাল প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে আছে। আর শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর একক ঔজ্জ্বল্য তাই অস্বীকৃত নয়। লক্ষ্যণীয় যে: উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরও শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বলা ভালো, সময়ের প্রয়োজনীয়তায় তার একটি ভিন্ন মূল্যায়ন হলেও তা প্রকৃতপক্ষে শিল্প হিশেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য কিনা, এ সম্পর্কে দ্বিধা অনিবার্য। এ ছাড়াও মধুসূদনের সাথে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিগত এবং মনোগত একটা বিরাট ব্যবধানও সুস্পষ্ট। যদিও বাইরের দিক থেকে এ ব্যবধান খুব দূরায়ত নয়। সত্য যে, রামমোহন প্রাচ্যের সাথে প্রতীচ্যের সংযোগ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করার দিক থেকে সম্পূর্ণ উদার ছিলেন। এবং উভয়েই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য উদার মানবতাকে সংযোজিত করে একটা উজ্জ্বল মানস গঠনে আকাঙ্খিত ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন ছিলেন অন্তর্গত মিলনের পথে সংযোজনকারী নাবিক কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে তিনি পাশ্চাত্য প্রাণ সাধনাকে এমনভাবে যুক্ত করেছিলেন, যা অবিচ্ছিন্ন। ভারতীয় বা ইউরোপীয় বলে যার স্বতন্ত্র চিহ্নন অসম্ভব। বরং একটি বৈশ্বিক চেতনা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তথা তাঁর সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত প্রেরণা। রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রেখে তার মূল সত্যকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের অন্তর-প্রেরণা ছিলো সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রাণধারাকে আবিষ্কার করে একটি নতুন স্রোত

ধারায় তাকে প্রবাহিত করে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের বহির্গত দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন, তেমনি তাঁর অন্তর্বৃত অনুভবেও এই বিশ্বসত্যের সংস্থিতি। অবশ্য স্বীকার্য, মধুসূদনের এই চেতনার অন্তরালে বিভ্রান্ত ধারণার অস্তিত্ব ছিলো না তা নয়। জীবনের প্রারম্ভে যে আকাঙ্খা তাঁকে বার বার আন্দোলিত করেছে, সেই আকাঙ্খাই তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আকাঙ্খা: বিদেশ যাবেন, ইংরেজীতে কবিতা লিখে বড় কবি হবেন। যেমন হোমার, মিলটন প্রমুখেরা হয়েছেন। যদিও তিনি 'ইংরেজ কবি' হতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু বড় কবি তিনি হতে পেরেছেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অস্থিরতা তাঁকে বার বার পরাজিত করেছে, রক্তাক্ত করেছে সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠায় যে কোনো রকম আঘাতকে প্রতিহতও করেছেন। যদি তা না হতো, তা হলে বাঙলা কবিতার নবজাগরণের অগ্রদূত মধুসূদনকে আমরা পেতাম না। নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র অথবা রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কবিতাতেও তাঁদের চেতনাগত সংক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু সেখানে সংক্ষোভ, একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ মধুসূদনের কাব্যে যে সংক্ষোভ তা প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপকতম জীবনবোধের প্রতিক্রিয়া। আর এ জীবনোপলব্ধির কারণও তাঁর জীবনানুষঙ্গের সাথে জড়িত। তাঁর ব্যক্তিমানস যে ভিত্তি আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, সে পরিবেশে তাঁর ভিত্তির সবলতা যে তেমন ভিন্ন-শক্তি হিশেবে চিহ্নিত হবার যোগ্য তা নয়, তবুও তাঁর শৈশব থেকে যৌবনাবধি জীবনের ছায়াপাত সেখানে অনিবার্যভাবে ঘটেছে। তাঁর মেঘনাদবধের রাম রাবণ, ব্রজাঙ্গনার রাধা একটি ভিন্নধর্মী ধারণার জন্ম দিয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘ বছর ধরে লালিত সংস্কারবোধকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার ভেতরে মৌল প্রক্রিয়াগত যতোই ভ্রান্তি থাকুক, তা যে নিসন্দেহে মধুসূসদনের বিদ্রোহী মানসের স্বাক্ষর-সমৃদ্ধ, একথা বলার অবকাশ রাখে না।

অথচ ব্যক্তিজীবনে মধুসূদনের উচ্ছৃংখলতাই তাঁকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর তিলে তিলে মৃত্যুর পেছনে এ কারণকে কোনো অবস্থাতেই সংকীর্ণ করে দেখা চলে না। মধুসূদন ব্যক্তিজীবনে উচ্ছৃংখ-

লতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্মের ভেতরে যে গভীর সংযম ও সংহতি লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়। আসলে সমগ্র বড় কবিদের ভেতরেই কি এই স্ববিরোধিতা (সেলফ-কন্ট্রাডিকশন) থাকে? আমার তো মনে হয় থাকে। আর থাকে বলেই কবির সৃষ্টিপ্রেরণা ক্রমাগত অগ্রসর হতে পারে। তবে একথা সত্য, কবির যে শৈল্পিক আদর্শ তা সব সময় ব্যক্তিজীবনের অনুসারী হবে, এমন কথা বলা যায় না। আর তাই মধুসূদনের কবিতার অন্তরালবর্তী প্রাণধারার ওপর নির্ভরশীলতাই কাব্য বিশ্লেষণের যথার্থ মাপকাঠি। যদিও সর্বত্র তা সমানভাবে নন্দিত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্লাবন বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ব্যাপকতম মানসকে যে ভাবে আলোড়িত করেছিলো, বুদ্ধিজীবী মানসে তা অনুরূপ নয়। বৃহত্তর মানসভুবন আলোড়িত হয়েছিলো ভিন্ন দিক থেকে। অর্থ্যাৎ প্রগতিশীল তরুণ-চেতনা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁর গভীরে প্রবেশ করতে না পারায়, তাঁরা হিন্দু সমাজের দীর্ঘলালিত প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদগার শুরু করেছিলেন, তাতে হিন্দুসমাজ 'নাস্তিকতার' প্রাধান্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন। আর নবজাগরণের স্পর্শ তাঁদের ক্ষেত্রে অতোটুকুই। মধুসূদন তরুণ চেতনার প্রতীক। ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শ তাঁর জীবনের অন্তরালবর্তী প্রেরণা। তবুও প্রশ্ন, মধুসূদন কি সম্পূর্ণত ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? আমার মনে হয়, তা তিনি হননি। আর হননি বলেই তাঁর পক্ষে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মতো প্রহসন লেখা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের ব্যক্তিক চরিত্রে স্বেচ্ছাচারিতা থাকলেও তা তাঁর সৃষ্টিকর্মকে আক্রান্ত করেনি। যদিও ব্যক্তিক চৈতন্যের প্রবল অভিসার তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মৌল বাণীনির্মাণ।

মেঘনাদবধ কাব্যের যে কাহিনী, তা রামায়ন থেকে নেয়া হয়েছে, এ সত্য সকলেই জ্ঞাত। কিন্তু রামায়নের কাহিনী এখানে সম্পূর্ণ প্রায় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ সত্য প্রচলিত হলেও

আসলে এর নেপথ্যে সঞ্চারিত মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থার ক্রম-অবক্ষয়। যে রাবণ যোদ্ধা, সেই রাবণই আবার স্বামী ও পিতা। এদিক থেকে সম্রাট শাহজাহানের সাথে রাবণের চৈতন্যপ্রবাহের মর্মত সাদৃশ্য রয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসের প্রতিনিধি রাবণ। ফলে তার পরিণতি, যা মেঘনাদ-বধ কাব্যে বিধৃত, তা অনিবার্য সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা কিংবা বীরাঙ্গনা কাব্যের কৈকেয়ী, শূর্পনখা, শকুন্তলা অথবা অন্য যে কোনো চরিত্রের উল্লেখ করা হোক, বাহ্যত পাশ্চাত্য কাব্য প্রক্রিয়া মধুসূদনকে যতোই আন্দোলিত করুক, কাব্যসমূহের অন্তর্বাণী নিসন্দেহে তাঁরই।

আসলে ব্যক্তিজীবনেও যেমন, কাব্যজীবনেও তেমনি মধুসূদনের একটি আলাদা চেহারা সুস্পষ্ট। যে চেহারা বাঙলা সাহিত্যের অন্য কোনো কবির ভেতরে অনুপস্থিত। ফলে এ সত্য উচ্চারণ স্বাভাবিক যে, মধুসূদনই বাঙলাদেশের ব্যক্তিচৈতন্য এবং কাব্য-প্রেরণার সেই মোহনা মিলিত নাবিক, যিনি পূর্বাপর একটি যুগ-সংকটকে ধারণ করে আছেন। একদিকে অতীত মুখী অন্ধকার উত্তরণ; অন্যদিকে ভবিষ্যতের অগ্রগামিতার দিক-দর্শন। এই উভয় যুগশিখাকে ধারণ করেছেন সেই শক্তিধর কবি মধুসূদন।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, মধুসূদনের আলোচনাতেও অনেকে দৃষ্টিভঙ্গী-গত সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, না খ্রীষ্টান ছিলেন এ প্রসঙ্গটি বড় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মধুসূদন এ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এমন প্রমাণপ্রাপ্যতা অসম্ভব। কারণ তাঁর খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করাটাই বলা চলে অপ্রতিরোধ্য জেদ মাত্র। ফলে তিনি ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন কিংবা খ্রীষ্ট ধর্ম তাকে খুব গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে বলেই তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছেন, একথা সত্য নয়। অপরদিকে তিনি খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন, এ জাতীয় বিশ্লেষণও সংকীর্ণ মানসতা উদ্ভূত। কোনো কবি বা তাঁর শিল্পকর্মের বিশ্লেষণে এভাবে তাঁকে টেনে নেয়ার ভেতরে কোনো উদারতার প্রশ্রয় নেই কিংবা সত্য সমীক্ষণেরও ইচ্ছে নেই। আর শিল্পকর্মের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সত্যসমীক্ষণ হচ্ছে অনিবার্য শর্ত।

মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে অথবা কাব্যজীবনে কোথাও এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেই। প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মীয়বোধ বা সে জাতীয় সংকীর্ণতা মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে যেমন অগ্রাহ্য, তাঁর কাব্যজীবনেও তেমনি তা পরিত্যাজ্য। মধুসূদন একটি অখণ্ড অস্তিত্বের মতো বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে নিজেকে স্থিতধি করে রেখেছেন। সংহত, সংযত, কৃতধি এক পুরুষ। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিচ্যুতি তাঁর কাব্যজীবনকে স্পর্শ করেনি? যদি তাই হবে, তাহলে মেঘনাদবধের রাবণের পরিণতি অতো করুণ হবে কেন? কাব্যযাত্রায় 'গাইব মা বীররসে ভাসি, মহাগীত' এই প্রতিজ্ঞাও কেন অনিবার্যভাবে ভেঙেচুরে নিশেষ হয়ে যাবে? তবে কি 'ট্র্যাজেডি' রচনায় নিয়তির প্রভাব পড়তে বাধ্য? যে গ্রীক ট্র্যাজেডী তার নিয়তিকে আশ্রয় করে ক্রমাগত করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, মধুসূদনের মেঘনাদবধেও কি তারই প্রভাব?

মধুসূদন অবশ্য অনেক স্থানে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটা রাবণের কর্মদোষের ফল। কিন্তু এ সত্য অকৃত্রিম নয়। কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনের পরাজয়ের বাস্তবতা কাব্যের মর্মে ছায়া ফেলেছে বলেই রাবণের এ পরিণতি। রাবণ চরিত্রের পরিকল্পনার নেপথ্যে মধুসূদনের নিজস্ব অস্তিত্ব অত্যন্ত বিশালভাবে ধরা পড়েছে, সন্দেহ নেই। আর তার ফলেই রাবণ আর রাবণ থাকেনি। রাবণ মধুসূদনের অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে। রাবণের করুণ পরিণতি মধুসূদনের জীবনের সাথে বাহ্যত না হলেও মর্মত সংযুক্ত।

মধুসূদনের আজীবনের সাধনা তাঁর উন্নাসিকতাকে ধারণ করে আছে। সেদিক থেকে তাঁর বিশ্লেষণ আমার মনে হয়, যথার্থ নয়। কারণ যে পরিবার-পরিবেশে তাঁর লালন, সেখান থেকে বিমুক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়। বরং সামাজিক পারিপার্শ্বিক লালন তাঁর মানস-বীজানুকে যে ভাবে পালন করেছে তা থেকে উন্নাসই সহজ-সম্ভব। কিন্তু মধুসূদনের এ উন্নাস দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকতে পারেনি। তবে অস্বীকার করে লাভ নেই যে, মধুসূদনের উন্নাসতাই তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রসারতার অন্যতম কারণ। কেননা যে আত্মপ্রত্যয়ী মানসতা একজন কবিকে ক্রমাগত উত্তীর্ণতায় সহযোগিতা

করে, মধুসূদনের ভেতরে সেই আত্মপ্রত্যয় ছিলো। আর তার ফলেই মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক সময় সংকট এবং তার উত্তীর্ণতার মোহনায় দাঁড়িয়ে নাবিকের মতো নতুন পথের অভিযাত্রায় দিক নির্দেশ করা।

রাবীন্দ্রিক ভুবনঃ উত্তীর্ণ অভিলাষ

প্রায়শ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সহজ-লক্ষণীয়। শুধুমাত্র বিশেষ সীমায় নয়, বিস্তৃত বিষয়াবলীতেও। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক অর্থ্যাৎ সাহিত্যের সমগ্র শাখায় আলোক-রশ্মিবিকীরণ বহুদূর-বিস্তৃত নয়। ফলে অন্তর গভীরতা-স্পর্শী না হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ খণ্ডিত। তাতে যা পাওয়া যায় তা রবীন্দ্র-হৃদস্পন্দনে পরিপূর্ণ নয় বরং গরল উদগীরণে মর্মঘাতী। এবং এ জাতীর বিশ্লেষণ দ্রুত নির্বাসিত হলেই ভালো, অন্যথায় বিভ্রান্ত-বিশ্লেষণী-বীজানু সমগ্র সাহিত্য-শরীরে বিস্তৃত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যা ইতিমধ্যে অনেক লক্ষণ অশুভতায় সংস্থিত। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার মানস-বিশ্লেষণ দুরূহ। যে গভীর অনুভূতি স্রষ্টার হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকৃত, তার ফলশ্রুতি যথার্থরূপে প্রকাশ সম্ভব, এ সত্য নির্ধারিত নয়। সব ভাবই কি ভাষায় প্রকাশ সম্ভব? ভাষা কি যথার্থই ভাব প্রকাশের মাধ্যম? এ প্রশ্ন তাড়িত অনেক কবিই। হয়তো সকল কবি। কিন্তু যাঁরা এর ব্যাপকতা সম্পর্কে স্থিরিত, তাঁরা মর্মতই ভিন্নতা অভিমুখী। র‍্যাবো এ স্থিরতার অন্যতম সাক্ষী। সতের বছর বয়সে যে কবিতা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব হয়েছিলো, পরবর্তী পর্যায়ে, তা আরো গভীরতর হয়েছে বলেই, র‍্যাবোকে কবিতা লেখা ছাড়তে হয়েছে। সংগতই র‍্যাবোর এ আত্মদর্শন উপেক্ষণীয় নয়। ভাষার ব্যাপকতা সুবিস্তৃত নয়, গভীরতা সমৃদ্ধ নয়। ভাষা শুধুমাত্র কতোগুলো অক্ষর বা শব্দমালার সমীকরণ। ফলে স্বভাবতই তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তুলনায় ভাবের গভীরতা এতোদুর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, মুষ্টিমেয় শব্দমালায় তার বিন্যাস অসম্ভব। আর এ কারণেই সঙ্গীত ও চিত্রকলার জন্ম। এবং ক্রমাগত নব্য অনু-সন্ধিৎসা। অবশ্য এ অনুসন্ধিৎসা সাহিত্যেই নির্দিষ্ট নয়। জীবন-প্রেক্ষা-

পটেও ব্যক্তি-মানসের ক্রমঅভিসার অপরিপূর্ণতা-জাত। মূলত মানব-মানসে জীবনানুভবের অনিবার্য ছায়াপাত। ফলশ্রুতিতে বৈচিত্র্য। এ কারণে মানব মানসের বিশ্লেষণ দুসাধ্য প্রচেষ্টা নিসন্দেহে।

রবীন্দ্রনাথ, যাঁর ছায়াপাত নির্দিষ্ট নয়। বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র শরীর অজস্রতায় তিনি বিস্তৃত আকাশ পাতালব্যাপী। কোনো সীমিত অভিধায় যাঁর মূল্যায়ন অসম্ভব, সেই রবীন্দ্রনাথই কি আত্মতৃপ্তিতে ধ্যানস্থ হতে পেরেছিলেন? পারেন নি। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্তি প্রতিটি চৈতন্য-অতৃপ্তির সাথে একাত্ম। জীবনই যেহেতু অসম্পূর্ণ, সেহেতু অতৃপ্তি অপরিপূর্ণতার স্বাক্ষর নয়। নিসন্দেহে এই সমীকরণ যুক্তিগ্রাহ্য। সে কারণেই র‍্যাবোর দুর্বিনীত আত্মদর্শন আর 'আত্ম' নয়, সমগ্র। কিন্তু তবুও মানুষ স্তব্ধ নয়। যেহেতু সামাজিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাস, সেহেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের তাগিদও অনিবার্য। এবং আত্ম প্রকাশের সীমাবদ্ধতার কারণেই বহু পথের আবিষ্কার।

রাবীন্দ্রিক বিশালতা শুধুমাত্র শব্দের নির্ধারণে সীমিত ছিলো না বলেই সুরের ঝংকারে, রঙের বৈচিত্র্যে ভাবের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সে ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু সব কবিই যেহেতু সুরস্রষ্টা বা চিত্রশিল্পী নন, সেহেতু তাঁদের অক্ষমতা যেন রুদ্ধগৃহ। ফলে নির্বাসন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। সেই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। বিশ্ব-সাহিত্যে শুধু নয়, বিশ্ব ইতিহাসে এক তুলনাহীন প্রতিভা। অতএব তাঁর বিশ্লেষণে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্থ প্রচলন অবশ্যই কাম্য।

রবীন্দ্রনাথ, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত একক বৃক্ষ। অতএব রাবীন্দ্রিক মানসের স্বরূপ সন্ধানে বৃক্ষের কেন্দ্রশেকড়ে মনোসমীক্ষণ অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনা মানবতার সাধনা। মানুষের কল্যাণচেতনা তাঁর হৃদয়-বৃন্ত জুড়ে। এই সাধনা কোনো বিশেষ দেশ-কালের আওতায় স্থিত নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেশকালের মৃত্তিকা-বিচ্যুত, এমনও নয়। আসলে বাঙলার দর্পণে বিশ্বের প্রতিফলন, যা মহৎ সাহিত্যিকের যথার্থ অভিলাষ, রবীন্দ্রনাথের জীবনবাসনা তা-ই। তাঁর সৃষ্টির অন্তর-ইপ্সা তাই—শুধু তাই। প্রকৃতই, তিনিই তো সার্থক স্রষ্টা, যাঁর সৃষ্টি দেশ-কালের হয়েও, সমগ্র

কালের, বিশ্বের। রবীন্দ্রনাথ কোনো ভৌগোলিক সীমায় বিশ্বাসী নন। ভূগোল উত্তীর্ণ হওয়াই রাবীন্দ্রিক-ভুবনের আসল কথা। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতে গিয়ে এ সত্য বিচ্যুত হয়ে বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও এমন কাল্পনিক এবং উদ্ভট মন্তব্য করা হয়েছে, যা রবীন্দ্রচেতনার উল্টোপিঠে স্থিত, যদিও রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ রাবীন্দ্রিক ফসলের ওপরেই নির্ভরশীল। সে ভিত্তিতে আলোচনা অসম্ভব নয়। তবে যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সমস্যার ব্যাপার। অনেক সময় স্রষ্টাও নিশ্চিত নয় তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতিফলিত অর্থ সম্পর্কে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দমালার মর্ম-উদ্ধারে স্রষ্টাই স্থিরিত নন। সে ক্ষেত্রে সমালোচকদের উদ্ভট মন্তব্য-সন্ত্রাস হয়তো গ্রাহ্য হতে পারে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-মানসের পূর্ণ পরিচয় না থাকার ফলে আপাতসমীক্ষাও যথার্থ হয়না। ফুলের সৌন্দর্য দেখা হয়, অথচ তার-ঘ্রাণ, তার আস্বাদ নেয়া সম্ভব হয় না। এ জাতীয় সমালোচনা অবশ্যই অখণ্ড নয়। কারণ কবি স্বতন্ত্র জগতের বিশিষ্ট অস্তিত্ব নন। তাঁর ব্যক্তি-মানস গড়ে ওঠে সামাজিক প্রেক্ষিতে। ফলে শৈশব থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত কবির মানসতা সমাজ প্রভাবিত। এবং এ সমাজ-প্রভাবিত মানসতার পরিচয় কবির জীবন ও চরিত্রের সাথে অবশ্যই যুক্ত। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে তাঁর পূর্বাপর জীবনকেও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তা না হলে তাঁর সম্পর্কে কোনো আলোচনাই পূর্ণতা পাবেনা। যেহেতু সাহিত্য জীবনেরই রূপায়ণ, সেহেতু সামগ্রিক জীবন-ভাবনার প্রতিফলন সেখানে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি-চেতনায় ব্যবধান স্বীকৃত বলেই স্রষ্টার সৃষ্টির মূল রহস্যের সাথে সমালোচকদের পরিচয় অসম্পূর্ণ। যদিও সৃষ্টির প্রকাশকেই স্রষ্টার অনুভূতির স্বীকৃতি হিশেবে গণ্য করা হয়, তবুও এ সত্য স্বীকার্য, প্রতিফলিত শব্দমালার ভেতরেই এমন বাণী সংগুপ্ত থাকে, যা সকলের কাছে ধরা পড়ে না। স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিফলনের নিয়ম-নির্দিষ্ট অর্থ যদি তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, তা হলে একটি বিশেষ বিষয়ের বিশ্লেষণে এতো মতপার্থক্য কেন? বলা যেতে পারে, বিশ্লেষণে স্ব-স্ব মতের আলোকরশ্মি বিকীরণে মূল সত্য আবিষ্কার করার প্রচেষ্টায়। অতএব স্ব-স্ব মত মানেই কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে তা গ্রাহ্য নয়।

আসলে স্রষ্টার সৃষ্টির বিচারে ধ্যান মগ্নতা চাই। অর্থ্যাৎ বিষয়ের সোপান বেয়ে সমালোচককে গভীরে যেতে হবে। স্রষ্টার অন্তর-অনুভবের সাথে একাত্ম হতে না পারলে বিশ্লেষণ খণ্ডিত হবেই। এবং বহির্গত ক্যামেরায় যতোই ক্লোজআপে স্রষ্টার অন্তরকে ধারণ করার চেষ্টা হোক না কেন, হাড়-মাংসের দীর্ঘ এবং প্রশস্ত প্রতিফলন ছাড়া সেখানে ভিন্ন কোনো প্রাপ্তি অসম্ভব। রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণে প্রায়শই এই বহির্গত প্রতিফলন সুলক্ষ্য। এই প্রতিফলনের দুটো শাখা: ক/ভাববাদী খ/বাস্তববাদী। প্রথম ধারার প্রতিফলনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সমগ্রতাকে এমন একটা আলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করা হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট। দ্বিতীয় ধারার প্রতিফলনে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাঁকে বিশেষ আওতায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ দ্বিতীয় ধারার মূল যে উপলব্ধি, তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে এ বিশ্লেষণের নামে রবীন্দ্রনাথকে এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা হয়ে থাকে।

প্রথম ধারায় রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে আদিম কৌশলে। দ্বিতীয় ধারাও প্রথম ধারানুসারী. তবে আধুনিক চাতুরীতে। দুটো ধারার মধ্যেই বিভ্রান্ত পথ পরিক্রমা, জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞানতা, শিল্প চেতনার যথার্থতা সম্পর্কে অন্ধতা তীব্র। অথচ রবীন্দ্র-মানস আজীবন যে কোনো রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি-অভিলাষী। হয়তো রাবীন্দ্রিক অনুভব অনেকক্ষেত্রে যথার্থ নয়, তাঁর অনেক বিশ্লেষণ অপ্রচ্ছন্ন নয়, তথাপি এ সত্য সর্বসম্মত, সবকিছুর ওপরে রবীন্দ্রনাথের মানসভুবনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন মানব জীবনের তলদেশে প্রবেশ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন জীবনের সত্যকে। যাঁরা এই চরম সত্যকে বোঝেননি, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রবিশ্লেষণে অগ্রগামী হওয়া অসম্ভব। সাহিত্যের মর্মবাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনের বিশ্লেষণে অর্থনীতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু যে কাজ সমাজতাত্ত্বিকের, রবীন্দ্রনাথ সে পথে যাননি কখনো; মূল, সত্যটিকে তুলে ধরেছেন মাত্র। অথচ বস্তুবাদী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ইজমের মধ্যে সংগুপ্ত করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী

ছিলেন। বৈপরীত্যে ভাববাদীরা তাঁকে অরূপ অলৌকিকতায় নিয়ে গিয়ে এমন মোহময়তায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন অসম্ভব। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ দ্রুত নির্বাসিত হলেই ভালো। রবীন্দ্রনাথ যা, রবীন্দ্রনাথ তাই। রবীন্দ্র-নাথকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে হবে। তা হলেই রাবীন্দ্রিক ভুবনের আসল পরিচয়, তাঁর উত্তীর্ণ-অভিলাষের প্রকৃত চেহারা উদ্ভাসিত হবে, অন্যথায় রাবীন্দ্রিক-চেতনার হত্যা ষড়যন্ত্র এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। এবং তা শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের জন্যও মর্মান্তিক বিনষ্টি হয়ে দাঁড়াবে।

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত

সুকান্ত কবি। কিন্তু কী ধরনের কবি? এ প্রশ্ন সাম্প্রতিক সময়ে সুকান্ত বিশ্লেষণে ভীষণভাবে মর্মবিদ্ধ। অনেকে তাঁকে শ্রেণীসংগ্রামের কবি হিশেবে চিহ্নিত করেছেন, অনেকে শ্রমিক সমাজের আওতায় বৃত্তাবৃত করেছেন। এ সকল মতই পরিপূর্ণভাবে সুকান্ত সম্পর্কে সত্য কিন্তু তার চেয়েও সত্য, তিনি মানুষের কবি। সন্দেহ নেই, সুকান্তের পূর্ববর্তী কাব্যধারায় 'মানুষ' যেভাবে উপস্থাপিত তা অনেক দূর থেকে দেখার ফলশ্রুতি। অন্তরঙ্গ অবলোকনে তাঁরা কেউই সুস্পষ্ট নন। ফলে 'মানুষ'এর ভেতরকার ব্যবধান তাঁদের কবিতায় যথার্থভাবে পরিস্ফুট নয়।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন মানব সাধনার পুরোহিত। উদার জীবন চেতনার ধারক হিশেবে তাঁর প্রসর অবলোকন আলোজ্জ্বল। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছেন আন্তরিকভাবে। কিন্তু মানুষের যে মর্মবাণী তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত করেছেন, সেখানে দেশের বৃহত্তর মানসভুবনের যথার্থ পরিচয় উদঘাটিত হয়নি। অবশ্য এ জন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপরে যে কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতার অবভাস অপরাধ হিশেবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। কেননা যে সমাজ পরিবেশে তাঁর মানস লালিত, সেখান থেকে এর বেশী অবলোকন অসম্ভব বলেই মনে হয়। বুর্জোয়া মানস লালনের প্রতিক্রিয়া যদি এই উপরিস্পর্শে সমর্পিত হয়, সে জন্যে তাঁর ওপরে খড়গহস্ত হবার প্রবণতা কোনো ক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না।

কারণ লক্ষণীয় যে, নজরুল, যাঁর সমগ্র কাব্যভাবনার মৌল, বিষয় মানুষ এবং যাঁর ব্যক্তিজীবনের উত্থান সেই সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে, তাঁর 'মানুষ' সম্পর্কিত প্রতিবেদনও অভ্রান্ত নয়। দীর্ঘদিন মার্কসবাদীদের সাহচর্যে থেকেও যাঁর পক্ষে 'মানুষের' মধ্যেকার ব্যবধান সুচিহ্নিত

করা সম্ভব হয়নি ; সেখানে রাবীন্দ্রিক চেতনার দুরত্ব তেমন কোনো ভ্রান্তি হিশেবে চিহ্নিত হতে পারে না। এ কারণেই সুকান্তের সাথে এক করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল অথবা অপরাপর কবিচেতনার বিশ্লেষণ যৌক্তিক নয়। সুকান্ত ব্যক্তি জীবনে মার্কসবাদী ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি'র একজন সক্রিয় সংগঠক হিশেবে স্বভাবতই তাঁর চেতনা লালিত হয়েছে সে ভাবেই। ফলে তাঁর কবিতাও যে অনিবার্যভাবেই মার্কসীয় তত্ত্ব-অনুসারী হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এ প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশ্লেষণে সুকান্তের সমধর্মিতা আশা করা অবাস্তব।

যথার্থ অর্থে সুকান্তই বাঙলা কবিতার নতুন ধারার উন্মোচক। যদিও ইতিপূর্বে আরো কেউ কেউ এ পথ পরিক্রম করেছেন, কিন্তু সেখানে অন্তর-প্লাবনের চেয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবিত-নিরীক্ষার প্রাধান্য থাকায়, তা বৃহত্তর মানস উপযোগী হয়নি। কিন্তু সুকান্ত মর্মের বাণীকে বর্মে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা তাই সমগ্র শ্রেণীর মানসকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। এ কথা সত্য যে, সুকান্তের অনেক কবিতাই নিছক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এমন অনেক কবিতাও রয়েছে, যা শিল্প স্বধর্ম চ্যুত নয়. যদিও এমত বিতর্ক এখন প্রায়শ উচ্চারিত, সুকান্ত কবি হিশেবে কতোটুকু সার্থক? কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে শৈল্পিক মান নির্ণয়ের চেয়ে বুর্জোয়া মানসবিলাসী আক্রমণ অনেক বেশী সক্রিয় থাকে। স্বীকার্য, নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে শৈল্পিক মান নির্ণয়ে কবি হিশেবে সুকান্তর স্থান নির্ণয়ে বিতর্ক লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু যুগের প্রেক্ষিতে সুকান্তের ভূমিকার উজ্জ্বলতর দিক তুলনাহীন। বাঙলা কবিতায় সুকান্তের আবির্ভাব এমন একটি সময়ে, যখন অধিকাংশ কবিচেতনা অবক্ষয়-আক্রান্ত। ক্ষয়িষ্ণু মানসতা কায়িক প্রাণনার উন্মোচনে অন্ধকার-আশ্রয়ী। সুকান্তই যথার্থ অর্থে বিশ্বের দ্বান্দ্বিক অগ্রগামিতার মূল সত্যকে স্পর্শ করে অবক্ষয়িত মানসতার বিরুদ্ধে নতুন 'ছাড়পত্র' দিতে পেরেছিলেন।

> যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
> তার মুখে খবর পেলুম .
> সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক

নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।

এবং এ সত্যপোলব্ধি :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।

অতপর এই আবির্ভাব স্বীকার করে নিয়েই উচ্চারিতঃ

চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

এ অনুভবের ধারক সুকান্ত। আসলে রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুলের পক্ষে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব। শোষক এবং শোষিতের ব্যবধানের স্বরূপ যিনি উপলব্ধি করেছেন এবং মার্কসীয় 'ডায়্যালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম' যাঁর চেতনায় প্রবাহিত, তাঁর পক্ষেই এ উচ্চারণ সম্ভব। সুকান্ত ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন এবং পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই নতুনের আবির্ভাবে পুরনোর অপসারণ তাঁর কাছে স্বাভাবিক। এই নতুন চেতনা-প্রবাহ আছে রাবীন্দ্রিক ভুবনেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তা নির্দিষ্ট। তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছেন, কিন্তু পথের ইঙ্গিত দেননি। নজরুল সব কিছু ভাঙতে চেয়েছেন, শোষক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছেন। কিন্তু যথার্থ শোষককে চিহ্নিত করতে পারেননি। সমাজের বৃহত্তর জনগণের জন্যে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিলো না। তিনি তাঁদের জন্যই লড়াই করতে চেয়েছেন মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন, চীৎকার করেছেন :

বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না

বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নজরুল তাদের মধ্যেকার ব্যবধান নির্ণয় করতে পারেননি। যে সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট রশ্মিবিকীরণ করলে গভীরতর অন্ধকারের ভেতর থেকেও মূল সত্যটিকে তুলে আনা সম্ভব, নজরুলের রচনায় তা ছিলো না। ফলে 'শোষক শোষিত' অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়ে গেছে, যা কোনোক্রমেই বিপ্লবীবোধের পরিচায়ক নয়।

রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ আক্রান্ত। হেগেলীয় দর্শনের সাথে মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যবধান সুচিহ্নিত। ভাববাদী বাস্তববাদ বা বাস্তববাদী ভাববাদ হেগেলীয় দর্শনের মূল কথা। আর 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' মার্কসীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। বস্তু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমাগ্রসর, এই বাস্তব সত্য সভ্যতার অগ্রগামিতার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদে আক্রান্ত ছিলেন বলেই কিছুতেই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতা যেমন, তেমনি কবিতা সম্পর্কিত তাঁর প্রতিবেদনও নির্দিষ্ট অভিধাকে ধারণ করতে পারেনি। এ কারণেই একবার ভাবের উদ্বৃত্ত প্রেরণাকেই তিনি কবিতার মূল সত্য বলে চিহ্নিত করেছেন, আর একবার বাস্তবতার শিল্পিত প্রতিকৃতিকেই শিল্পের মৌল প্রেরণা বলে অভিহিত করেছেন। একবার ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছে, আর একবার বাস্তবতা নন্দিত হয়েছে। আর এই দ্বন্দ্বই আদর্শ নির্ণয়ে তাঁকে বাধা দান করেছে। ফলে ক্রোচের vision বা অন্তর্দৃষ্টি রাবীন্দ্রিক মানসতায় কোনো সুস্পষ্ট রশ্মিপাতে সমর্থ হয়নি। অথচ রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপকতম ভুবনে এই অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা বিস্তৃত। তবুও তাঁর পক্ষে পক্ষে মানবিক লাঞ্ছনায় ব্যথিত হওয়া ছাড়া শোষকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রকাব্যের জন্মসূত্র থেকে মৃত্যুসূত্র পর্যন্ত শুধু মানবতার জয়গান। এমনকি বিপ্লবোত্তর রাশিয়া পরিভ্রমণ এবং 'রাশিয়ার চিঠি'তে তাঁর মানস ব্যক্তকরনের পরেও তিনি মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হননি, কিম্বা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। হয়তো মহৎ প্রতিভার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধও এর কারণ হতে পারে। তবুও সত্য, মানুষের কথা বলেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের

কাছ থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছেন। যেমন ঘটেছে ভিন্নতর প্রেক্ষিতে নজরুলের ক্ষেত্রে। কিন্তু সুকান্তই এই দূরত্ব কমিয়ে নতুন-সত্যের দিক-নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছেন। মানবিক-সত্য উচ্চারণে তিনি বহুদূরে তাঁর দৃষ্টি প্রতিফলিত করেননি। বরং জীবনকে কাছ থেকে দেখে, উপলব্ধি করে কবিতায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় বিপ্লবের সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত। কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের বৈপ্লবিক কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। কিন্তু তা কোনোক্রমেই ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে নয় অথবা উপরি-অনুভব থেকে নয়।

তবুও সত্য, সুকান্তের এ পরিচয়ই তাঁর সামগ্রিক পরিচয় নয়। যাঁরা কৌণিক-বিশ্লেষণে তাঁকে শুধু বাস্তবতার স্থূল-শিল্পী হিশেবে চিহ্নিত করতে চান, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয়তত্ত্ব-বিরোধী। কেননা, জীবনের বিচিত্র অনুভবে কবিচৈতন্যের প্রকাশ বহুমুখী হতে পারে, যেহেতু মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নার পরিচয় 'জঠরের ভ্রূকুটি' উপেক্ষা করেও জাগ্রত। ফলে কতিপয় তথাকথিত মার্কসীয় চেতনার ধারকেরা প্রেমিকচৈতন্যের প্রকাশকেই 'বুর্জোয়া মানসতা' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন, যা মূলত ব্যক্তিক সুবিধা আদায়ের কুক্রিয়-প্রবৃত্তিজাত। কেননা, মার্কস প্রেমকে কখনো অস্বীকার করেননি। সুকান্ত মার্কসীয়তত্ত্বের নিপুণ ধারক বলেই তাঁর পক্ষে নিটোল প্রেমের কবিতাও লেখা সম্ভব হয়েছে। এবং আজকে যাঁরা যুগের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত-বিশ্লেষণে তৎপর, সুকান্তের কবিতা তাঁদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে সমর্থ হয়েছে :

> এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
> প্রত্যেক নিভৃতক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
> এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি
> নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি ;
> এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
> তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে
>
> [রবীন্দ্রনাথ]

অতএব রবীন্দ্র-বিশ্লেষণে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ অবশ্যই গ্রাহ্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যতোটুকু মানুষের, শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে তিনি যতোই

দূরে থাকুন না কেন ; তা কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য নয়। যেমন অগ্রাহ্য নয় নজরুল। ভুললে চলবে না যে, আজকের পটভূমিতে একটি বিশেষ মুহূর্তের উত্তেজনায় যা অস্বীকারের চেষ্টা হচ্ছে, তাতে বাস্তব ভিত্তির চেয়ে আবেগের অস্তিত্বই বেশী। স্মরণ্য, রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল ইতিহাসের বিচারে স্বীকৃত হলেও তা ইতিহাস-সম্পৃক্ত। এ কারণেই তা অস্বীকৃত হতে পারে না। তা ছাড়া এ-তো ঐতিহাসিক সত্য, মহৎ প্রতিভা কোনো বিশেষ যুগসীমায় আবদ্ধ নয়। এবং তাঁর যুগোত্তীর্ণ শিল্পী-মানসতার বিচার শুধুমাত্র বক্তব্য-নির্ভর নয়। শৈল্পিক মান নির্ণয়ই তাঁর মানস-পরিচয়কে মূর্ত করে। যে কারণে হাজার বছর আগের প্রাচীন সাহিত্যও যুগাতিক্রমী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

পূর্বেই বলেছি, শৈল্পিক মানের প্রশ্নে সুকান্ত 'কবি' হিশেবে বিতর্কিত। কিন্তু তা হলেও তিনি কবি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত তাঁর বিপ্লবী কবিতার বাইরেও তাঁর যে প্রেমের কবিতা এবং গীতিগুচ্ছ রয়েছে, তা একজন কবি-শিল্পীকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করায়। লক্ষণীয় :

১) ওগো কবি তুমি আপন ভোলা
আনিলে তুমি স্থির জলে ঢেউয়ের দোলা।
মালাখানি নিয়ে মোর
একি বাঁধিলে অলখ ডোর !
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কি সুর তোলা !

২) হে মোর মরণ, হে মোর মরণ
বিদায় বেলা আজ একেলা
দাও গো শরণ।

৩) হে পাষাণ, আমি নির্ঝরিণী
তব হৃদয়ে দাও ঠাঁই।
আমার কল্লোলে
নিঠুর যায় গলে
ঢেউয়েতে প্রাণ দোলে
—তবু নীরব সদাই !

৪) ফোটে ফুল আসে যৌবন
সুরভি বিলায় দোহে
বসন্তে জাগে ফুলবন
অকারণে যায় বহে

তখন এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। সুকান্ত কাব্যচেতনার বৈপরীত্য-মূলক ধারায় এ সব কবিতা ভিন্নতর অর্থ বহন করে। তথাকথিত মার্কস-বাদীদের বক্তব্য এ সকল কবিতার বিরুদ্ধে কী আঘাত হানবে? প্রেমের কবিতা বলে কি তবে সুকান্তর এ সকল পংক্তিমালা অগ্রাহ্য হবে?
আসলে কবিতা কবিতাই। জীবনবহির্ভূত কোনো সাহিত্যই স্বীকৃত নয়। মানবিক আশা-আকাঙ্খা, যুদ্ধ সংগ্রাম, সবকিছু মিলিয়েই জীবন। আর এ জীবনের অকৃত্রিম প্রতিফলনই মহৎ স্রষ্টার দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে যে কোনো সীমিতিই সাহিত্যের ব্যাপকতাকে সংকুচিত করে, যা সাহিত্য না হয়ে শুধু শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। মাও-সে-তুঙ-এর মন্তব্য মনে পড়ে: সাহিত্য শুধু শ্লোগান হবেনা, তার শিল্পগুণও থাকতে হবে। কিন্তু তা অবশ্যই জীবন বিরোধী হবে না। এই সত্য শব্দবিন্যাস অনুসারে সুকান্তর এ সকল গীতিগুচ্ছ অবশ্যই শিল্পিত; যেমন রবীন্দ্রনাথের এবং নজরুলের গীতিগুচ্ছ।
বলার অবকাশ রাখেনা, অর্থহীন আবেগ-প্রবণতার যন্ত্রশ্রুতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যে স্থিত মনোআলোবন সৃষ্টিকর্মের বা স্রষ্টা-মানসতার মৌল অনুভব উদ্ধারে সক্ষম, তা থেকে দূরে সরে তাৎক্ষণিক উল্লাসকে প্রাধান্য দেয়ায় কবিচেতনার অপরাপর বৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হয়না। রবীন্দ্র-নাথকে 'উপনীষদীয় কবি' হিশেবে এবং নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' হিশেবে চিহ্নিত করে তাঁদের অন্যান্য দিককে সযত্নে পরিহার করার চেষ্টার মধ্যেও এ জাতীয় প্রবণতা আছে। সুকান্তের ক্ষেত্রেও সমজাতীয় প্রচেষ্টা তাঁর 'কবিচেতনা' হত্যার ষড়যন্ত্রমাত্র। পূর্ববর্তী কুক্রিয় প্রচেষ্টা দৃষ্টান্ত হিশেবে সম্মুখে রয়েছে বলেই এ প্রবণতা প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
অবশ্য কবিতার সুবিধাবাদী চরিত্র ব্যতীত যাঁরা রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত-বিশ্লেষণে তৎপর, তাঁদেরকে শুধুমাত্র বক্তব্য নয়, তার শিল্পমানতারও বিচার

করতে হবে। তার অর্থ এ-ও নয় যে, কবিতায় বক্তব্য মূল্যহীন। যে কোনো সার্থক কবিতাই তার বক্তব্য ও তার শৈল্পিক উপস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। বক্তব্য বলতে আমরা তার স্থূল অর্থকেই বড় করে দেখছি না, তার অন্তর্গত গভীরতার দিকেও আলোকপাত করতে চাইছি। এ কথা বলার অবকাশ রাখেনা যে, বক্তব্য বা ভাবকে কেন্দ্র করেই ভাষা বা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বক্তব্য বা ভাব। ফলে উভয়ের সার্থক সম্মিলন এ ক্ষেত্রে প্রধান কথা। এ কারণে এর বিশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ যথার্থ হতে পারে না।

এ প্রেক্ষিত মনে রেখে সুকান্তকে বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কবিতার প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হবে। দলীয় স্বার্থে অথবা ব্যক্তিক স্বার্থে কোনো কবিকে ব্যবহার করা অবশ্যই মহত্বের পরিচয় নয়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ কবি, মানুষের। নজরুলও কবি, মানুষের আরো কাছাকাছির। কিন্তু সুকান্ত কবি, মানুষের, সর্বহারার। ত্রয়ীচৈতন্যের উপলব্ধিই অকৃত্রিম, শুধু দেখা এবং তার প্রকাশের মধ্যে ভিন্নতা। ফলে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে বাদ দিয়ে যেমন সুকান্ত হতে পারে না, তেমনি সুকান্তকে বাদ দিয়েও রবীন্দ্রনাথ, নজরুলও হতে পারে না। একমাত্র 'কবি' এই মোহনা-মিলনে ত্রয়ীচৈতন্যের অন্তর-সংযোগ বিতর্ক রহিত হতে পারে এবং এই মোহনা-মিলনই রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের যথার্থ পরিচয় উদঘাটন করতে পারে ; অন্য কিছু নয়।

সৃষ্টিকর্ম, তার অন্তর্নিহিত দ্যোতনার নির্ভরতা সুনির্দিষ্ট নয়। স্রষ্টার অনুভব যেমন নির্ধারিত নয়, তেমনি নয় তাঁর সৃষ্টিকর্মও। কেননা উভয়ত তা বিচ্ছিন্ন নয়, সংযুক্ত। একটি থেকে অন্যটির পৃথকায়ন অসম্ভব এ ক্ষেত্রে। অনুভব, উপলব্ধি সকল যুগে, সকল সময়েই বাধাহীন, ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, উন্মুক্ত আকাশে যার অনিশেষ সঙ্কলন। কোনো স্রষ্টার হৃদয়-কপাট বন্ধ করে দেয়ার অবিবেকী ক্রিয়াকর্ম হয়তো চলে, কিন্তু তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হয়; তার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। চেতনালোকে বহির্দৃশ্যের যে অদৃশ্য আলোড়ন সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, তা যে কোনো পটপ্রেক্ষায় উজ্জ্বলতা-চিহ্নিত। এ ক্ষেত্রে জয় স্রষ্টার, দস্যুর নয়। পৃথিবীর যে কোনো ক্ষেত্রে এই অসাধারণ সত্য দুর্লক্ষ্য নয়। তবুও এই প্রয়াস চলে, সৃষ্টি বিদ্ধ হয়, যন্ত্রণাক্ত হয়। কিন্তু মহৎ সৃষ্টির প্রাণশক্তি এমনই যে তা ক্রমাগত জেগে ওঠে, আঘাতেও উজ্জ্বল হয়। খাঁটি সোনার এই সার্থকতার নামই আসলে সাহিত্য। সত্য যে, এই নির্ধারণের জন্যে নিক্তির প্রয়োজন হয়, যার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ। সৃষ্টিকর্মের মহত্ত্বের যে সত্যটি বার বার উচ্চারিত, তার জন্যেই আসে বিশ্লেষণের প্রশ্ন। তা না হলে যে কোনো সৃষ্টিই সাহিত্য হতো, মহত্ত্বের শিরোপা লাভে সমর্থ হতো। হতে পারে, বিশ্লেষণের ভারসাম্য রক্ষিত হয়না প্রায়শ, সুরেশ সমাজপতিরা যে কোনো এক রবীন্দ্রনাথকেও ললাট কুঞ্চিত করতে বাধ্য করেন, সজনীকান্ত দাসেরাও যুগে যুগান্তরে বহু বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হন, এ যুগেও তার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। কিন্তু এই কি সব? মূলত এ প্রশ্নের যথার্থ প্রতিবেদনের ওপরেই নির্ভরশীল ভারসাম্য এবং ভারসাম্যহীনতার প্রশ্ন। উৎসেই সকলে বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্মান না। 'প্রতিভা' শব্দটি যদিও বিতর্কিত, তবুও

আমাদের মনে হয়, এর অনস্তিত্ব গ্রাহ্য নয়। আর সে কারণেই প্রতিভা-হীন-প্রতাপ মূঢ়তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু যারা প্রতিভার চিহ্নিত-লক্ষণসমূহ উপলব্ধির ললাটে ধারণ করে অবভাসিত শব্দসত্যের সার্থকতায় পৌঁছে যান, তাঁরা কোনো আঘাতেই বাধাগ্রস্ত হন না। এ জাতীয় প্রতিভা অবিরল নয়। আর সে কারণেই বিশ্লেষণের প্রয়োজন। সঠিক আলোক স্রষ্টাকে উদ্ধার করে, পথ পরিক্রমণে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু সুরেশ সমাজ-পতি কিংবা সজনীকান্ত দাসেরা বিপরীত-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যাঁরা এ কৈফিয়তে একে প্রতিহত করতে চান, নির্বাসিত করতে চান ওজনপরিমাপের নিক্তিকে, তাঁরা তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভের সুযোগী পথ অতিক্রমের প্রয়াসে মত্ত হন। তাঁদের প্রতিভায় যেমন শূন্যতা, মানসতায়ও তেমনি। আমাদের মনে হয়, যে কোনো মহৎ স্রষ্টার হৃদয়স্পন্দনে এই বিস্তৃতির স্বাক্ষর দুর্লভ নয়। স্বীকার্য, স্রষ্টা যেহেতু স্নায়ুর শিহরিত স্পর্শ থেকে বিমুক্ত নন, সেহেতু ব্যক্তি-মানসতার স্থূল অবলেপন কোথাও কোথাও তাকে স্থূলতায় নেমে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু সে স্থূলতার দৃশ্যমান চেহারাতেও আভি-জাত্য আছে। তাঁরা কখনো এমন দাবী করেন না, নির্বাসিত হোক নিক্তি, বন্ধ হয়ে যাক সমালোচনা। অথবা এমন হোক, যেখানে প্রশং-সার অন্ধ প্রতিধ্বনি জেগে উঠুক মুহূর্তে মুহূর্তে, ভারসাম্যহীন সমালোচনার কাটাটি হেলে থাক এক দিকে, যা নিজের অনুকূলে কাজ করবে দাসের মতো। সন্দেহ নেই, এই চৈতন্য-লালন ভয়ানক কুক্রিয়াশীল। আত্ম-তৃপ্তির শীর্ষতম শিখা স্পর্শ করার অন্ধ গৌরবের এর চেয়ে নগ্ন দৃষ্টান্ত কিছু হতে পারে বলে আমাদের ধারণা নেই।

অবশ্য সকলেই যে এই ধারণা পোষণ করেন তা নয়। যাঁরা সমালো-চনার বর্মে বিদ্ধ হতে অরাজী, অথচ সমালোচনায় বিশ্বাসী, তাঁরা উপরোক্ত মতের আপাতবিরোধিতা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের মনোপ্রতিক্রিয়া : সমালোচনা=সম+আলোচনা এই রকম। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় সুস্পষ্ট, তাঁরা নিরপেক্ষ সমালোচনায় বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের ধারণা, সমালো-চনা কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। যদি হয়ও, তা হলে ধরে নিতে

হবে, তা অবশ্যই অত্যন্ত ঘৃণ্য অর্থে সমান সমান। কোনো সমালোচকই যথার্থ সমালোচনার দর্পণে সকল স্রষ্টার মানসতার প্রকৃত প্রতিফলনে সমর্থ নন, এটা সুনিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে এ প্রয়াসে যারা লিপ্ত, তাঁরা নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তা স্বীকৃত নয়। অন্তর্নিহিত অর্থে তাঁরাও অনিরপেক্ষ। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি ব্যক্তি থেকে আলাদা, সেহেতু তাঁদের মানসতা, উপলব্ধি ও অনুভবও ভিন্ন। এই অনুভব কিংবা উপলব্ধির যদি যথার্থ প্রতিফলন ঘটে, তা হলে একটি 'কমন' কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রতিটি মানসতার সংযুক্তি কী করে সম্ভব। বাস্তবে এটা অযৌক্তিক, ফলে অগ্রাহ্য।

আমাদের প্রতিক্রিয়া : সমালোচনা অনিবার্যভাবেই অনিরপেক্ষ হতে বাধ্য। এর ধারা দুটোই হতে পারে। (ক) ইতিবাচক (খ) নেতিবাচক। এর মাঝামাঝি কোনো স্থিরিতি অসম্ভব। সাহিত্যে বণিকী স্বভাব অচল। তাই বাটখারা মিলিয়ে সাহিত্যের সঠিক চেহারা কিংবা পরিমাপ নির্ণয় মূলত অবাস্তব ও অযৌক্তিক। যাঁরা এ প্রয়াসে সমর্পিত, এটা নিশ্চিত, তাঁরা আত্ম-প্রতারক। সুবিধাবাদী সমালোচকরা সব সময়েই ভীরু এবং কাপুরুষ হয়ে থাকেন। আর তাই জোড়াতালি দেবার বিবেকহীন মানসতা তাঁদেরকে বিপথিক করে তোলে। এটা সাহিত্যের সঠিক দিকনির্ণয়ের পথে চরম কুক্রিয়াশীল ভূমিকা বলেই নিন্দিত। যাঁরা সুরেশীয় কিংবা সজনীয় পদ্ধতির নিন্দায় মুখর, আমাদের ধারণা, তাঁদের কাছে এই পদ্ধতিও সমভাবেই নিন্দনীয়। ফলে উভয় পদ্ধতির চরিত্র-লক্ষণ একই কেন্দ্রে সংযুক্ত। বিশ্বসাহিত্যের সমালোচনার ধারা লক্ষ্য করলে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেখানে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, যা শুধুমাত্র প্রথাগত নয়। একটি কৌণিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেরিয়ে আসার বহুবিধ প্রয়াস সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়। শুধুমাত্র অন্তর-আদর্শের এই পরিবর্তনই নয়, বহিরঙ্গেও পরিবর্তন ক্রমাগত নতুনতা উদ্ভাসনে সক্রিয় সেথায়। এই পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট স্তর রয়েছে, যা ধাপে ধাপে বিস্তৃত বিশ্লেষণের দিকে অগ্রগামী। সন্দেহ নেই, এই পদ্ধতিই আপেক্ষিকভাবে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক। কেননা যে কোনো সমালোচকের পক্ষেই সামগ্রিক বিশ্লে-

বণের একত্রিত-প্রয়াস বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। ফলে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন ধারার বিচ্ছিন্ন, অথচ অবিভক্ত আলোকন সঠিক পথ নির্ধারণে সক্ষম। কিন্তু এখানে বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনার ধারা এখনো উৎসাভিমুখী। বিশেষত বাঙলাদেশে এ ধারাটি যেহেতু সাহিত্যের ব্যবসায়ীদের আওতা-সংযুক্ত, সেহেতু বণিকী স্বভাব-অতিক্রমী যথার্থ সমালোচনা এখনো দুর্লভ। যাঁরা সৃষ্টি করেন এবং যাঁরা তার বিশ্লেষণের কারিগর, তাঁরা আত্মবিক্রিত হলে কোনোক্রমেই সত্যের উন্মোচন সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ, সহযোগী সৌজন্য, সর্বোপরি নিজস্ব 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখার ঘৃণ্য কাপুরুষতা এখানকার অধিকাংশ সমালোচকের মজ্জাগত। বিশেষত একটা ভারী এবং ওজনসমৃদ্ধ পর্যায়ে থেকে তাৎক্ষণিক মওকা লাভের যে লজ্জাহীন প্রতাপ এখানে সর্বগ্রাসী, সাহিত্যের বণিকেরাও তা থেকে বিমুক্ত নন। প্রায়শ এ সব ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মানসতার কৈফিয়ত সোচ্চার হয়ে ওঠে। সমালোচকের নিজস্ব দায়িত্ব ও আত্ম দোষ স্খালনের জন্যেই এই পদ্ধতি যথাযথ বলেই এই অপপ্রয়াস অন্তহীন। সুরেশ সমাজপতি কিংবা সজনীকান্ত দাসের ভেতরে যে সততা ছিলো, আমাদের সমালোচকদের ভেতরে সে সততাটুকুরও অভাব মারাত্মক। শুধুমাত্র আত্মসর্বস্ব কেন্দ্রিকতার মধ্যে থেকে সমালোচনার নামে চৌর্যবৃত্তি ও বিবেকহীন 'নিরপেক্ষতা' যে একটি ঘৃণ্য পন্থা তা সুনিশ্চিত। আমাদের সমালোচকেরা তা বোঝেন না, এমন নয়। তা সত্ত্বেও এই প্রয়াস কেন? তার কারণ অক্ষমতা। প্রতিভার অভাব। সমালোচনাকে যারা শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত বলে মনে করেন না, তাঁরা বাজারী দলিল লেখকের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন, তার বেশী নয়। কেননা যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁর শৈল্পিক প্রাণের নিভৃতে একটি ভিন্ন মানুষ, একটি ভিন্নতর বোধ কাজ করে। সত্য, বহিরঙ্গে যে কাঠামো গড়ে তোলা হয়, তা পূর্বপরিকল্পিত। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রতিবেদন অনিবার্যভাবেই সমালোচকের নিজস্ব ও মৌলিক অনুভবের ফলশ্রুতি। সমালোচনাকে কবিতা, গল্প, উপন্যাসের সাথে সংযুক্তবিশ্লেষণে 'শিল্প' অবভাসে অবভাসিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই 'শিল্প' হিশেবে স্বীকৃত। যেমন

চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র 'শিল্প' কিনা এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্তে যে কোনো প্রেক্ষিতেই এর 'শিল্প' স্বীকৃতি অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে এটি নির্ভরশীল কোনো প্রথাগত সংজ্ঞায় নয়, স্রষ্টার শৈল্পিক-প্রাণের অনুভূতি ও তার প্রকাশপদ্ধতির সার্থকতার ওপর। এ দিক থেকেই সমালোচনাও শিল্প।

অথচ আমাদের সমালোচকরা অক্ষমের নিষ্ফল আস্ফালনে যা করতে চান, তা না হয় শিল্প, না হয় সমালোচনা (নিরপেক্ষ)। কুড়িয়ে নেয়া সামগ্রীর সাহায্যে তাঁরা যে স্তূপ তৈরী করেন, তা নির্মমভাবেই আত্মস্বার্থের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। সমালোচনার প্রধানতম যে শর্ত—মৌলিক চিন্তা, তা এই সকল পাপী সমালোচকদের মস্তিষ্কের কোষে একটুও যে জমা নেই, তা তাঁদের লেখা পড়লেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশ্চর্য এই যে, নিজেদের এই দীনতার স্বীকৃতির মাধ্যমে অগ্রগামিতায় অভিসারী হলে সে ক্ষেত্রে কৈফিয়তের সুযোগ থাকে। কিন্তু আমাদের উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতা এতোই স্ফীত যে, শূন্যতা সত্ত্বেও পিছিয়ে থাকার রূঢ়তম সত্যকে স্বীকার করায় আমাদের সমালোচকদের কুণ্ঠার অভাব নেই।

আর এর ফলে যা হচ্ছে, তাকে সমালোচনা হিশেবে স্বীকৃতি দানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পূর্বেই বলা হয়েছে, সমালোচনার দুটো ধারা—ইতি-বাচক, না হয় নেতিবাচক। এই শব্দগত অভিধায় বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়। ইতিবাচক সমালোচনার অর্থ শুধু এ নয় যে, স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের সমগ্রতা শুধু প্রশংসার শিরোপা লাভের যোগ্যতা রাখে। তেমনি নেতি-বাচক সমালোচনা শুধুমাত্র নিন্দা লাভের জন্যে, এমনও নয়। বস্তুত এই শব্দ-সত্যের যথার্থতা নিরুপিত হতে পারে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীর এপিঠ ওপিঠের ওপর। স্রষ্টার যতোটুকু প্রাপ্য; তা তাঁকে দিতেই হবে, তেমনি তাঁর নিন্দার অংশটুকুও সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু প্রায়শ যে কোনো একটিকেই সমালোচনার নিরপেক্ষতা হিশেবে চিহ্নের প্রয়াস লক্ষণীয়, যা কোনোক্রমেই সমালোচনা নয়। সমালোচনার ইতিবাচকতা অথবা নেতিবাচকতা সমালোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল। তিনি এর যে কোনোটিকে প্রধান হিশেবে বেছে নিতে পারেন মাত্র। সে

ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং এ কারণেই এই দ্বৈত বিশ্লেষণের উল্লেখ। কিন্তু এ দেশের পূর্বাপর সমালোচনা-সাহিত্যের দিকে তাকালে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে: ইতিবাচক—সমালোচক—নেতিবাচক-এর মাঝামাঝি অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার সাহসী পদক্ষেপ অস্পষ্ট, দুর্লক্ষ্য। এ কারণেই সমালোচনা—এই ঘনীভূত, ওজনসমৃদ্ধ শব্দের কাছে পাঠকদের যা প্রাপ্য, তা নির্বাসিত; উপরন্তু এক অশ্লীল, জঘন্য ও ঘৃণ্য শব্দ-সম্ভার তাঁদের মগজে তীব্র আঘাত হানায় তৎপর। বলাবাহুল্য, এটাই আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান পরিচয়। যাঁরা এই অন্ধকার বিবর-উন্মোচিত নতুনত্বের দিক আলোকনে সক্রিয়, তাঁরা সাম্প্রতিক সময়ের। এবং এঁরা স্বাভাবিকভাবেই কতিপয়। স্বীকার্য, এঁরা সমালোচনার ভিন্নতর ধারার অনুসারী মাত্র, নতুন ধারার উন্মোচক নন। ধারাবাহিক শূন্যতার মধ্যে তবুও এ অনুসরণ গ্রাহ্য ও অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু এই অনুসরণীয় আত্মপ্রশান্তি যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী নয়, সেহেতু অনিবার্যভাবেই ভবিষ্যত-প্রেক্ষাপটে আলোকপাত আমাদের কোন প্রত্যাশার প্রত্যুত্তর এনে দেয়, সেটাও বিচার্য। কেননা সুরেশ সমাজপতি কিংবা সজনীকান্ত দাস যে সময়ে সক্রিয়, সে সময়েও নতুনতর ধারার সাহসী কারিগরেরা এক বিপ্লবী উন্মার্গতায় যে ধারা-অবলম্বিত পথ আবিষ্কারে সচেষ্ট, আমাদের এখানে তেমন কোনো সাহসী পদক্ষেপও দুর্লক্ষ্য। যা তরুণ সম্প্রদায়ের উচ্ছল উন্মাদনার মধ্য থেকে বিস্ফোরিত হবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে লোহিত হয়ে ওঠা জরুরী, তেমন কোনো সম্ভাবনার কোরকে তা' দেয়ার মতো উত্তাপও এখানে অনুপস্থিত।

এই হতাশাবিদ্ধ পটভূমির অন্তরাল থেকে নিশ্চই অগ্রগামী ভূমিকাস্পর্শী কোনো না কোনো সমালোচকের আবির্ভাব ঘটবে। যেহেতু প্রতিভাদীপ্ত শক্তি খুব সহজলভ্য নয়, সেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে এর অস্তিত্ব এখানে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু এই শূন্যতার সুযোগে যে সকল সুযোগসন্ধানী, আত্মবিক্রিত, মধ্যপন্থী সুবিধাবাদী সমালোচকেরা 'নিরপেক্ষতা'র নামে মূলত সাহিত্য ও শিল্পের দ্যোতনাকে স্তব্ধ করে দিতে তৎপর, তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানা অত্যন্ত জরুরী। এদের অস্তিত্ব নির্বাসিত

করতে হলে ক্ষেত্র কিংবা পটভূমি প্রস্তুতি অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর এর মধ্য থেকেই সমালোচনা সাহিত্যের যে ধারাটি তার নতুন পথ উন্মোচন করে এগিয়ে আসবে, তা-ই হবে যথার্থ সত্য, সাহসী ও তীর্যক; যা প্রকৃতই 'সমালোচনা'—এই শব্দের সত্যতাকে সমৃদ্ধ মর্যাদা দানে সক্ষম হবে।

যাত্রা থেকে নাটক

সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবেই আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন স্বাভাবিক। অন্যথায়, বিশ্ববর্তমানে ক্রম-অভিসার অসম্ভব ছিলো। অলৌকিক পরিবর্তন বিস্ময়কর হলেও তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ফলে তার মধ্য থেকে যথার্থ পরিচয় উদঘাটন অসম্ভব। শিল্প (Art) সম্পর্কে এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রাকৃতিক নিয়মের মতো চেতনার অন্তর্বৃত কোরকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট হতে থাকে। এবং তা হয় অস্থির অবস্থাকে স্থিতিশীল করে তোলার জন্যেই। আর এ কারণে বাঙলা নাটক সম্পর্কিত প্রচলিত প্রতিবেদনও তাই গ্রাহ্য নয়। এ সত্য স্বীকার্য, বাঙলা সাহিত্যের সকল শাখাই পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিপুষ্ট। কিন্তু তা বহির্গত দিক থেকে যতোখানি, অন্তর্গত দিক থেকে ততোখানি নয়। কারণ অন্তর পরিপুষ্টি নিজস্ব হতে বাধ্য। অন্যথায় সৃষ্টিকর্ম কখনো সার্থক হতে পারে না। সমগ্র মহৎ সাহিত্যই এ সত্যে সমৃদ্ধ। অথচ বাঙালী ঐতিহ্য যেন বাঙালীয়ানায় নয়, পাশ্চাত্য প্রভাবে। এ প্রবণতা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথে চরম প্রতিবন্ধক। অবশ্য শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার ভেতরে তেমন কোনো গৌরব নেই, যদি মানবিকবোধ হৃদয়ে প্রবলতা না পায়। একজন সচেতন মানুষ বাঙালী হয়েও যেমন মানুষ হতে পারেন, তেমনি একজন অন্য সংস্কৃতির বাহকের পক্ষেও তা সম্ভব। আসলে এটি নির্ভরশীল সম্পূর্ণরূপে নিজের ওপর। এ কথা মনে হলো এ জন্যেই যে, বাঙলা নাটক বর্তমানে যে অবস্থায় এগিয়ে এসেছে, সে যেমন তার বাঙালীপ্রাণতার কারণে নয়, তেমনি তা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলশ্রুতি এ মতও গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এ সত্য

উচ্চারণ এখন অনিবার্য যে, বাঙলা নাটকে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ প্রধানত যাত্রা বা সমজাতীয় পালা থেকেই। আধুনিক নাটকে যুগযন্ত্রণা, জীবন-জটিলতা ইত্যাদি অর্থ্যাৎ এক কথায় জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ থাকে এবং এই প্রকাশ নিয়মবন্ধনে আবদ্ধ। এ নিয়মবন্ধনই দৃশ্য বিভাগ। অবশ্য এখন নাটকে দৃশ্য বিভাগের ব্যাপারটি ক্রমশ সংকুচিত। কিন্তু তা শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই। দৃশ্য বিভাগ সম্পূর্ণ নির্বাসিত করতে হলে নাটকের ক্ষেত্র বা ধারা পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বীকৃত দৃশ্য বিভাগ। ফলে প্রাচীন ধারার সাথে এর দূরত্ব নির্ণয় অসম্ভব। যেহেতু নাটক শুধুমাত্র দর্শনীয় নয়, তার পঠনেরও একটি দিক রয়েছে, সেহেতু শিল্পমূল্যের প্রশ্নটিও এর সাথে জড়িত। প্রাচীন আমলে যে সব যাত্রা প্রচলিত ছিলো, তার অধিকাংশ শিল্পমূল্যের বিচারে কোনোক্রমেই গ্রাহ্য নয়। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টার সৃষ্টির অক্ষমতাই প্রধান সমস্যা। কারণ এ যুগে আধুনিকতার স্পর্শ আছে বলে সব নাটকই মহৎ, তা নয়। তেমনি প্রাচীন আমলে যে সকল যাত্রা লিখিত, তার সবগুলোই অগ্রাহ্য, এ মতও সঠিক নয়। কিন্তু মহৎ সৃষ্টি অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ না হয়ে পারে না। প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাটককে বলেছেন দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য এ কারণে যে, দৃশ্যের প্রয়োজন নাটক মঞ্চায়নের সুবিধার্থে, আর কাব্য সৃষ্টিকর্মের বাহন। আধুনিক প্রেক্ষিতে এ বিশ্লেষণের নন্দিত এবং গ্রাহ্য প্রতিবেদন আবিষ্কার অসম্ভব নয়। সাহিত্যের উত্তরণে কাব্যের ব্যবহার ভিন্নতর হতে পারে। অর্থাৎ দৃশ্য = মঞ্চ সম্পৃক্তি এবং কাব্য = শিল্প-স্বীকৃতি হলে আধুনিক নাটকের সাথে যাত্রার পার্থক্য দাঁড়ায় শুধুমাত্র মাত্রা বিন্যাসে। অতএব যাত্রা থেকে নাটকে অতিক্রমণ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই স্বাভাবিক। বলা যেতে পারে, যদি নাটকের উৎস যাত্রাই হয়ে থাকে, তবে তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত না হয়ে নাটক প্রভাব বিস্তার করলো কেন? তার কারণ আর কিছু নয়, বিভ্রান্তি। যেখানে তা নয়, সেখানে আবেগের প্রাবল্য এর নেপথ্যে ও সপথ্যে সক্রিয়। শুধুমাত্র নাটকে কেন, ব্যাপকতর জীবনধারায়ও এই বিভ্রান্তি দুর্লক্ষ্য নয়। কারণ যা কিছু উজ্জ্বল, যা কিছু মহৎ তার সবই পাশ্চাত্য-উদ্ধার, আমাদের চেতনা আবৃত ঐ জাতীয় অ-মহৎ

কল্পনার। বিলাসী মানসতার এই দর্পণে আত্ম-প্রতিকৃতি অবলোকনের ইতিহাস আমাদের প্রকৃত চেহারাকে আজো স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। আধুনিক নাটকের জন্মের পেছনে যাত্রা বা পালাগানের প্রভাব তাই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। অথচ এতে উন্নাসিকতা ও সত্য অস্বীকারের প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নেই। লক্ষণীয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত মানসিকতায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো, তার ফলে তখন যে সব নাটক লিখিত ও মঞ্চস্থ করা হয়েছিলো, তার অস্তিত্বও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার কারণ পাশ্চাত্য প্রভাবের মৌল প্রাণস্পন্দনের চেয়ে তার আপাতআলোড়নে যারা স্পন্দিত হয়েছিলো, তাদের পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আর এ কারণেই উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নাট্য সংগঠন শুরু হলেও দীর্ঘ সময় ধরে তা ব্যর্থতার ইতিহাস আশ্রিত। শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশে পাশ্চাত্যের অনুসরণে নাট্যযাত্রার ইতিহাসে ইংরেজী শিক্ষিতদের লজ্জাকর প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। কারণ বাঙালী আয়োজিত প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় ইংরেজী নাটক ইংরেজী ভাষাতেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে। অথচ বিদেশী হয়েও বাঙলাদেশের নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ রুশ হেরেসিম লেবেডেফ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এম, জডরে-লের 'দি ডিজগাইস' নাটকের বাঙলা অনুবাদ বাঙালীদের দ্বারাই অভিনয় করান। এ দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের অতি-মাত্রিক উন্নাসিকতার ফলে ১৭৯৫—১৮৫৯=৬৪ বছর এদেশে কোনো ভালো নাটক লিখিত বা মঞ্চস্থ হয়নি। যদিও রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখেরা মাঝখানে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, কিন্তু নাটকের শৈল্পিক মানের প্রশ্নে তাঁরা মোটেই গ্রাহ্য নন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মধ্য দিয়েই প্রথম শিল্পসুষম অভিযাত্রা। অতএব যাত্রা বা পালাগানের প্রতি উপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি হাস্যকর উন্নাস ছাড়া আর কিছু নয়। মধুসূদনের নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ভারতীয় আদর্শে রচিত। সংস্কৃত নাট্যকলার অর্থাৎ সংস্কৃত আলংকারিকদের 'দৃশ্যকাব্য'-এর অনুপ্রেরণায় 'শর্মিষ্ঠা'র প্রায় সম্পূর্ণ অংশ আবৃত। যাত্রা বা পালাগানের ঢঙ ব্যবহার করে মধুসূদন এ নাটকটিকে একটি আশ্চর্য সৃষ্টি হিশেবে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে আধুনিক নাটক

মানেই পাশ্চাত্য প্রভাব, এমত ধারণায় যারা বিশ্বাসী, তারা এ উদাহরণে নির্বাসিত হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এ সত্য স্বীকৃত, মহৎ সৃষ্টি কোনো বিশেষ প্রভাবের কাছে সমর্পিত নয়। ফলে আধুনিক নাট্যরচনা সম্পূর্ণই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল—এ জাতীয় প্রবক্তাদের মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক স্মরণ করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা নাটকের ইতিহাস থেকে বিচ্যুত যে 'যাত্রা', তার অন্তর্বর্তী কারণ ইংরেজী শিক্ষিতদের অবজ্ঞা। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সম্মিলনে মহৎ সাহিত্য রচনার দিকে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিলো না। যে কারণে যাত্রা নির্বাসিত, সে কারণেই আধুনিক নাটকের যাত্রারম্ভে যা লিখিত হয়েছিলো, তাও নিশ্চিহ্ন। অথচ উভয়েই যেখানে সম্মিলিত, সেখানে তা মহৎ সাহিত্য হিশেবে যুগে যুগে স্বীকৃত। দেশ, কাল, সমাজবিচ্ছিন্ন রচনা অতিক্রমী পাঠকমানসে কোনো ছায়া ফেলতে পারে না। ফলে তা তাৎক্ষণিক হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রয়োজন থাকলেও মহৎ শিল্প স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয় না। যেহেতু মহৎ স্রষ্টা কোনো বিশেষ আওতায় সীমাবদ্ধ নন, সেহেতু তাঁর মৌলিকতাই তাঁকে ভাস্বর করে। আর স্রষ্টার মৌলিকতা মানেই তাঁর দেশ-কাল পরিপার্শ্বের শৈল্পিক এবং নবতর উন্মোচন। সমাজবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি তাৎক্ষণিক আকর্ষণে সমর্থ হলেও, তা কৃত্রিম। জীবনের স্পর্শে, দেশকালের স্পর্শে থেকেও অলৌকিক শব্দ নির্মাণ কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। কারণ এ জাতীয় সৃষ্টির অন্তরালে সত্য-সংকোচনের সচেতন বা অবচেতন প্রচেষ্টা থাকে। বাঙলা নাটকের প্রারম্ভ বা জন্ম সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এই প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ্য নয়। লক্ষণীয়, বর্তমান সময় পর্যন্ত নাটকের পাশাপাশি যাত্রাও সচল। এবং যাত্রার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ এখনো তীব্রতর। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ-দেশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকের কথা সরবে ঘোষণা করা হলেও, এর অগ্রগামিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। কারণ, নাটক দর্শকদের জন্যে যেমন, পাঠকদের জন্যেও তেমনি। দ্বৈত সমীকরণ যেখানে যথার্থ, সেখানেই সার্থকতা স্বীকৃত। পাশ্চাত্য প্রভাবিত অধিকাংশ নাটকই দর্শক সহজভাবে গ্রহণ করেননি। কারণ, অবাস্তব কাহিনী, উদ্ভট উপস্থাপন, দুর্বোধ্য সংলাপ ইত্যাদিতে অধিকাংশ নাটক আক্রান্ত।

ফলে দর্শক মানসে তা কোনো শুভ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ গ্রাম-বাঙলার অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে যাত্রার আবেদন উনিশ শতকে যেমন ছিলো, আজো তেমনি আছে। তার অর্থ এ নয় যে, নাটক শুধুমাত্র দর্শক মানস গ্রাহ্য হবে। দর্শক+শিল্পমান-এর সমীকরণে নতুন ধরনের নাটক রচিত হলে বাঙলা নাটকের শূন্যতায় হতাশ হওয়ার কিছুই থাকতো না। প্রকৃতপক্ষে অভিযাত্রায় যে ভুলভিত্তির ওপরে আসন স্থাপন করা হয়েছিলো, তাই নাট্য-উজ্জ্বলতার সম্ভাবনাকে হত্যা করেছে। কেননা, প্রচলিত 'যাত্রা'কে আধুনিকীকরনের বদলে ইংরেজী শিক্ষিতরা প্রথমেই ইংরেজী নাটক নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর যে কোনো সৃষ্টি কর্মই আমাদের অনুপ্রেরণা হতে পারে। কিন্তু তা যদি নিজস্ব সৃষ্টিকর্মকে আবৃত করে অথবা নিজস্ব মৌলিকতাকে খণ্ডিত করে, তা হলে তা অবশ্যই গ্রাহ্য হতে পারে না। উনিশ শতকের হঠাৎ আলোড়িত তরুণেরা এ সত্য হৃদয়ে ধারণ করতে পারেনি বলেই, নাট্য-অভিযাত্রা যথার্থ অর্থে আজো সার্থক হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যে সেই সার্থক নাট্যকার কই? বিশ্বের নাট্যসাহিত্য যখন ক্রম-উত্তরণের পথে, তখন বাঙলা নাটক কতোদূর পর্যন্ত প্রসারিত?

ফলে আত্মপ্রশস্তি কিংবা আত্মপ্রশান্তি যতোই উচ্চতা স্পর্শ করুক না কেন, তা যে আসলে শূন্যতায় আস্ফালন মাত্র, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সত্যকে অস্বীকার করা গৌরবের পরিচয় নয়, বরং তা আত্মহননের পথ আবিষ্কার মাত্র। কেননা, এটাও সত্য নয় যে, বাঙলা নাটকের জন্ম শুধুমাত্র যাত্রার প্রভাবের ফলশ্রুতি। আমাদের বক্তব্য: নাটকের জন্ম-অভিসারের কেন্দ্রীয় প্রেরণা শুধুমাত্র যাত্রা বা পালাগানের; কিন্তু তার অঙ্গসৌষ্ঠব, অলংকরণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলশ্রুতি। নাটকে নিবেদিত মানসতা এই সত্যের দিকে দৃষ্টি প্রতিফলিত করলেই নাটক এবং নাটকের ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।